Received on 4. 10. 52.
বিশ্বভারতী
পত্রিকা
সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

বিষয়সূচী

স্বাক্ষর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
রেখার রীতি ও প্রকৃতি	শ্রীনন্দলাল বসু	৩
স্বরাজসাধনা	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৮
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	১৮
ওড়িয়া কবি রাধানাথ ও মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	৩৪
চিঠিপত্র	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০
আলোচনা		
রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান		৪৬
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভা'	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮
স্বরলিপি : কেন ভোলো, ভোলো চিরসুহৃদে	শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	৪৯
চিত্রপরিচয়	শ্রীকানাই সামন্ত	৫০

চিত্রসূচী

আনন্দ ও প্রকৃতি	শ্রীনন্দলাল বসু	১
সাঁওতালি বিবাহ-উৎসব	শ্রীনন্দলাল বসু	৪৮
কলমে লেখা ছবি	শ্রীনন্দলাল বসু	৫
প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র ॥ বল্লাহরিণ ও বাইসন		৪
অজন্তা ও মোগল-চিত্র ॥ অংশ		৫
জৈন পুঁথিচিত্র ॥ পারসিক চিত্র		৫
কালীঘাটের পট		৬
লেখাঙ্কনরীতির যুগল চিত্র ॥ চীনা		৬
লেখাঙ্কন ॥ পারসিক ও চীনা		৭

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণ কপোলতলে
রাতের বিদায়-চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে।

২

'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে'
কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে।
তারা বলে, 'যে তোরে জাগায়
মোর জাগা ঘোচে তার পায়।'

৩

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে।

৪

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,
ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা।
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে
গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা।

৫

বায়ু চাহে মুক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ—
দুই বিরুদ্ধের যোগে
মঞ্জরীর নাচ।

৬

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্যামল রাখে প্রাণ।

৭

যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘশ্বাস।
সে যেন রাতের আঁধার দ্বিপ্রহর—
পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর।

লেখন গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই লেখনগুলির স্বরু হয়েছিল চীনে ও জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তার পরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুক্‌রো লেখাগুলি জমে উঠল।' ১৩৩৪ কার্তিকে কবির হস্তলিপির প্রতিলিপিরূপে লেখন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'স্ফুলিঙ্গ' নামে অনুরূপ কবিতাবলীর আর-একটি সংকলন প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৫২ সালে।

স্বাক্ষর দেওয়ার উপলক্ষ্যে লেখা কবিতার সংকলন ঐ দুখানি গ্রন্থেই শেষ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কবির এই শ্রেণীর অপ্রকাশিত নূতন কবিতার সন্ধান কেহ যদি দিতে পারেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কৃতজ্ঞ হইবেন ও ঋণস্বীকারপূর্বক যথাকালে তাহা গ্রন্থে সংকলন করিবেন।

বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত কবিতাগুলি প্রধানতঃ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে; সংকলন-কর্তা শ্রীঅমিয়কুমার সেন। ১, ৪, ৫, ৭ -সংখ্যক কবিতার ইংরেজি-মাত্র লেখন গ্রন্থে আছে। ৩ -সংখ্যক কবিতার একটি পাঠান্তর লেখনে আছে—

চাহিয়া প্রভাত-রবির নয়নে গোলাপ উঠিল ফুটে।
'রাখিব তোমায় চিরকাল মনে' বলিয়া পড়িল টুটে।

রেখার রীতি ও প্রকৃতি

শ্রীনন্দলাল বসু

ছবিতে বস্তুরূপের কতকগুলি গুণ ধরা পড়ে। গড়ন, গতি, আয়তন, ওজন ও স্পৃশ্য গুণ (texture)। এগুলি ছবিতে ফলাতে গিয়ে রেখার ঘের (outline), গড়নের ছক (block) ও ছায়াতপ (shade-light) ব্যবহার করতে হয়। রঙ ছবিতে ভাবাবেগের ব্যঞ্জনা দেয় শুধু।

শুধু রঙ দিয়ে কোনো বস্তু দেখানো যায় না। বরং রেখার ঘের দিয়ে গড়ন ও গুণের কথা অনেক বলা যায়। রেখা ও ছায়াতপ দিয়ে আঁকার পর, রঙ দিলে, বস্তু আরও স্পষ্ট ও নয়নরঞ্জক হয়।

পূর্বেই বলেছি, ছবিতে একটা বস্তুর গড়ন, গতি, ওজন, দৃশ্য ও স্পৃশ্য নানা গুণ নানা কৌশলে বোঝানো যায়। কিন্তু, রেখা দিয়ে ঐ গুণগুলির ব্যঞ্জনা সবচেয়ে ভালো হয়।

ছবি আঁকার কাজে নানা ধরনের রেখার ব্যবহার আছে। তার মধ্যে লিখনের রেখা ও গড়নের রেখা এই দুটি মুখ্যভাগ করা চলে।

[একপ্রকার মিশ্র রেখাও আছে। তার উদ্দেশ্য যে-কোনো উপায়ে বস্তুর স্পৃশ্য গুণ প্রকাশ করা। ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর, এমনকি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, স্পৃশ্যতার ভেদ বোঝাবার জন্যে যেখানে যেমনটি প্রয়োজন তেমনি হয় রেখার ধরন। কাপড়ের ভাঁজে আর ধাতুর অলংকারে আর মনুষ্যদেহে রেখার কায়দার বদল হয়ে চলে।]

পারস্যে ও চীনে কলম দিয়ে, তুলি দিয়ে, কথা লেখার যে কায়দা আছে তাকে বলা হয় ক্যালিগ্রাফি (calligraphy)। বাংলায় লেখাঙ্কন বলা যেতে পারে।

লেখাঙ্কনের গুণাগুণ কিছু জানা চাই। অক্ষর লেখার বিশেষ কৌশল বহু দিন ধ'রে বহু আয়াস ক'রে শিখতে হয়। পারসিক ও চীনা লেখাঙ্কনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, প্রায় সব ভাষাতেই ভালো লেখার বেলা একই রূপ কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ প্রমাণ (proportion) ও টান লেখায় ব্যবহার হবে তা নির্দিষ্ট আছে, তা সর্বত্র একই রকম হওয়া চাই। অক্ষরগুলি স্পষ্ট, সুসমঞ্জস ও মালার মতো শ্রেণীবদ্ধ হবে। পঙ্‌ক্তিগুলি ঋজু ও সমান্তর হবে। কাগজ বা পাটার নির্দিষ্ট সীমানার ভিতর লেখার বিষয়টির ঠিক-ঠিক সংকুলান হওয়া চাই। লেখাটি কাগজের নির্দিষ্ট স্থলে মানানসই ভাবে সাজানো হবে। লেখা এবং লেখার অবকাশ বা ফাঁক যথোপযুক্ত ও সুন্দর হওয়া যাই। অক্ষরগুলি পুষ্ট, দৃঢ় ও নির্ভীক হবে ; তাড়াহুড়ার ভাব থাকবে না, অথচ সাবলীল স্বচ্ছন্দ হবে। লেখকের নিজস্ব ধরন থাকবে ; অর্থাৎ লেখকের চরিত্রের ছাপ প'ড়ে লেখায় একটি চারিত্র ফুটে উঠবে।

পাকা লেখা বলতে যা বোঝায় তা ব্যাখ্যা ক'রে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

লেখাঙ্কনের রেখা করণ (instrument) -ভেদে দুরকম : কলমে লেখা ও তুলিতে লেখা। কলমে লেখা রেখায় কালী সব জায়গায় সমান গাঢ় থাকে এবং রেখার সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা আগাগোড়া একরূপ হয়, তারের পাতের মতো দেখায়। এই রেখার সমান চওড়া হবার দিকেই ঝোঁক থাকে ; কেবল কলমের খতের জন্য, আর লেখার সময় হাত ঘুরিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে টানার জন্য, কোথাও সরু, কোথাও বা মোটা হয়। তারের পাতের মতো ভাব, ধাতব গুণ (metallic quality) —এই হল এই রেখার বিশেষত্ব।

তুলিতে-লেখা রেখায়, কালী ঘন থাকলে সব জায়গায় সমান গাঢ় হয়। কিন্তু, রেখাটি আগাগোড়া সমান চওড়া না হয়ে সরু-মোটা হবার দিকে ঝোঁক থাকে, খানিকটা ঘাসের পাতার মতো। কালী পাৎলা থাকলে রেখা টানবার মুখে কোথাও গাঢ়, কোথাও ফিকে হয়। আবার কম কালী তুলিতে নিলে রেখাতে শুক্‌নো বা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাব দেখানো যায়।

মিশর, পারস্য, চীন, ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, এসব জায়গায় লেখবার করণ (instrument) ও উপকরণ (material) -ভেদে লিখনপদ্ধতিতে নানা বৈচিত্র্য, নানা গুণের নানারূপ তারতম্য, লক্ষ্য করা যায়। মিশরীয়, পারসিক ও ভারতীয় লেখকেরা অনেক সময় তুলির পরিবর্তে খাঁকের বা ইস্পাতের কলমে লিখতেন এবং ছবিও আঁকতেন। চীনারা লেখা ও আঁকা দু'ই কাজই তুলি দিয়ে ক'রে থাকেন।

খাঁকের কলমে, লোহার কলমে[১] রেখা আগাগোড়া সমান চওড়া হয়, কালী ঘন থাকে, রেখার দুটি ধার চোখা (sharp) হয়, একটি ধাতব ভাব থাকে। কলমে খত কাটার দরুন সরু-মোটা করা সম্ভব হলেও, রেখার দুটি ধার চোখা থাকেই।

চীনা লেখা তুলি দিয়ে টানা বলে রেখা সরু, মোটা, গাঢ়, হাল্কা, চেপ্টা, ধ্যাব্‌ড়া নানা রকম হয়। তুলি নমনীয় লোমের তৈরি ব'লে লেখবার সময় হাতের চাপে ইতরবিশেষ ক'রে ঐসব বৈচিত্র্য দেখাবার সুবিধা হয়। আর-এক কথা, তুলির রেখার দু ধার স্বভাবতঃ চোখা হয় না; মোলায়েমই হয়ে থাকে। সমান চওড়া রেখা টানবার জন্য তুলি খাড়া ক'রে ধরতে হয়, সমান চাপ দিতে হয়। কাত ক'রে তুলি টানলে এক দিক চোখা, অন্য দিক মোলায়েম করা যায়; যে দিকে তুলির ডগা থাকে সে দিকটা চোখা আর যে দিকে তুলির পেট থাকে সে দিকটা মোলায়েম হয়। আবার তুলি জল বা ফিকে কালীতে ডুবিয়ে, ডগায় ঘন কালী নিয়ে রেখা টানলে, তার কতকটা গাঢ় কতকটা হাল্কা হওয়ায় shaded line-এর মতো দেখতে হয়: গড়নের রেখার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

মোট কথা, তুলি দিয়ে নানা প্রকারের রেখা টানা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভঙ্গী ও স্পৃশ্যগুণ দেখাবার জন্যে চীনা শিল্পীরা তুলির বহু প্রকার টান আবিষ্কার ক'রে গেছেন। যেমন— ১। তারের মতো দেখতে ২। তাঁতের মতো দেখতে ৩। ঘাসের পাতার মতো দেখতে ৪। রেশমি সুতোর মতো দেখতে ৫। মাকড়সার সুতোর মতো টান (মাকড়সা যেমন চলার সঙ্গে সঙ্গে সুতো ছাড়ে তুলি টানার সময় তুলির মুখ দিয়েও তেমনি রেখা বেরোবে) ৬। মেঘের গতির মতো টান ৭। জলের লহরের মতো টান ৮। কেঁচোর মতো দেখতে ৯। জঙ-ধরা পেরেকের মতো দেখতে ১০। গিঁটওআলা দড়ির মতো দেখতে ১১। শুকনো কাঠের মতো দেখতে ১২। কাঠে উইয়ে-খাওয়ার দাগের মতো দেখতে ১৪। সাপের গতির মতো টান ১৫। মাথাওআলা গজালের মতো দেখতে ১৬। ছেঁড়া চটের মতো দেখতে ১৭। ভাঙা শরপাতার মতো দেখতে ১৮। চুলের মতো দেখতে (কেবল সরু নয়, রেখার টানটা আগাগোড়া সমান চওড়া এবং কালীর ঘনতা একরূপ হওয়া চাই)।

পারসিকেরা খত-কাটা খাঁকের কলম ব্যবহার ক'রে, রেখা টানার কৌশলে, ধাতুর পাত গুটিয়ে গেলে ও পাতের শেষটা কাটা থাকলে যেমন দেখায় সেই ভাবটা আনেন। আর, কলমে খত থাকে ব'লে রেখার শেষটা কখনো চুলের মতো, কখনো বা পাত-কাটার মতো দেখানো যায়।

১ জৈন পুঁথি খত-কাটা ও চেরা লোহার কলমেও লেখা হয়।
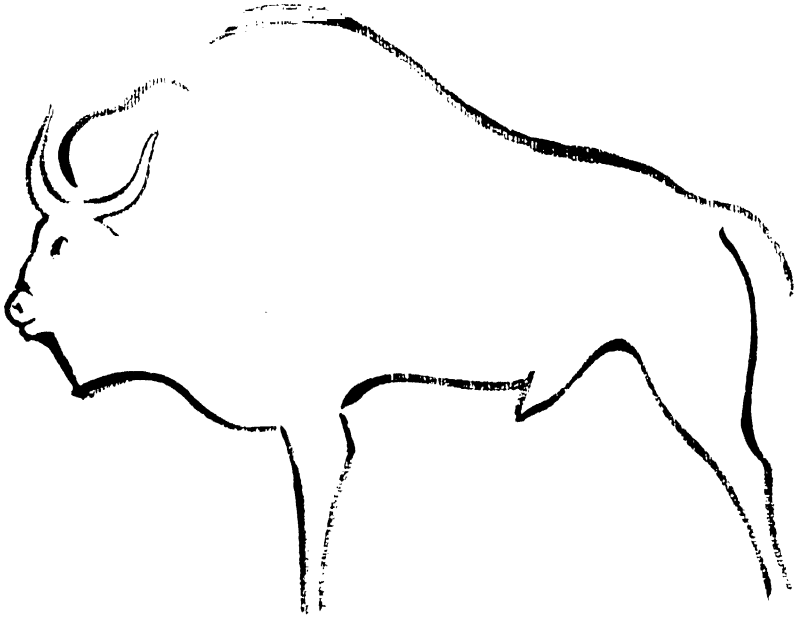
প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র । বল্গাহরিণ ও বাইসন
প্রাণবন্ত গড়নের রেখা । পনেরো-কুড়ি হাজার বৎসরের পুরানো ছবি

মিশ্র । গড়নের রেখা— অজন্তা গুহার চিত্র (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) এবং মোগল চিত্র 'বাহাদুর শাহ্' (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক)

ঘের-দেওয়া রেখা— জৈন পুঁথিচিত্র (পঞ্চদশ শতক) লেখাঙ্কনের রেখা— পারসিক (সপ্তদশ শতক)

কলমে লেখা ছবি ॥ শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত

বিলাতে পালখের কলম দিয়ে আর লোহার নিব দিয়ে কখনো কখনো লেখা ও ছবি আঁকা হয়েছে। পালখের কলম দিয়ে লেখা, সরু তারের পাত অল্প মুচড়ে নিলে যেমন দেখায় সেইরূপ। কিন্তু খাঁকের কলমে রেখার শেষটা যতটা চওড়া দেখানো যায় এ ক্ষেত্রে ততটা নয়; কারণ, পালখের কলমের ডগা একটু সরু ক'রেই কাটা থাকে।

ছুঁচোলো লোহার নিবে কেবল ছুঁচের আঁচড়ের মতো রেখা টানা হয়; খুব ধাতব ভাব থাকে।

তুলি দিয়ে সব রকম রেখাই টানা যায়; তবে তুলির রেখার একটা বিশেষত্ব থাকবেই।

ছবিতে পারসিক ও চীনারাই ঠিক-ঠিক লেখাঙ্কনের রেখা ব্যবহার করেছেন। অপরাপর প্রাচ্যদেশীয় ছবিতে রেখাগুলি প্রায়ই বিষয়বস্তুর ঘের হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। লেখাঙ্কনরীতির রেখাও ছবির ঘেরের কাজ করে বটে, কিন্তু তার একটা নিজস্ব নির্বস্তুক (abstract) ধরন আছেই— শুধু রেখার খেলাটাই একটা স্বতন্ত্র উপভোগের বস্তু।

কালীঘাটের পট ॥ রেখানিবদ্ধ খসড়া

শ্রী অজিত ঘোষের চিত্রসংগ্রহ

যখন রূপের ভঙ্গী ও ভাব সম্পর্কে শিল্পীর দরদ ক'মে আসে, তা প্রকাশ করবার বিষয়ে তেমন মনোযোগ থাকে না, তখনই রূপের ছলে কেবল অলংকরণ করার দিকে শিল্পীর অভিনিবেশ বা ঝোঁক আসে। চিত্রে লেখাঙ্কনরীতির প্রয়োগ হয় তখনই। পুঁথিচিত্রণে ও ঘর সাজাবার কাজে বহু শতাব্দ ধ'রে এর বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। এটা মনে রাখতে হবে, কেবল সুইপ দিয়ে টানা অথবা অনায়াস ক্ষীপ্রতার সঙ্গে টানা হলেই হয় না, লেখার বা রেখার কায়দা ও দক্ষতা দেখাবার উদ্দেশ্যে যে রেখা বা লেখা তাকেই লেখাঙ্কন বলা হয়।

রেখার বিলম্বিত টানে বহুক্ষণস্থায়ী সংযমের দরকার, রেখার দ্রুত টানে অল্পক্ষণস্থায়ী সংযমের প্রয়োজন। কিন্তু উভয় রেখার টানেই দৃঢ়তা, অব্যর্থতা এবং তৈলধারাবৎ মনঃসংযোগ বা অভিনিবেশ থাকা চাই। বিলম্বিত লয়ের রেখা বিলম্বিত মিড়ের মতো। দ্রুতপ্রসৃত রেখা সুরের দ্রুত গমকের মতো। যখন ভাবকেই অনুসরণ করে মন, মনের একাগ্রতায়, তুলির টানে দৃঢ়তা ও অব্যর্থতা ফুটে ওঠে।

কোনো রূপের গড়ন বা ভঙ্গী বিশেষ ক'রে ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে, প্রকট ক'রে তোলবার আগ্রহে, যে রেখার ব্যবহার তা অন্যরূপ। প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীদের চিত্রে, লোকচিত্রে, নিগূঢ়ভাবব্যঞ্জক ছবিতে, নানা দেশে আর নানা যুগেই তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া, এ কথা সকলেই জানেন।

আমাদের মনে হয়, চিত্রিত বস্তুর গড়নে, গুণে, আর রেখা টানার ধরনে সামঞ্জস্য রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুর, তাল, লয় ও ভাব মিলে যেমন গান সম্পূর্ণ হয়। অথবা বুদ্ধদেব লিচ্ছবিবাসীদের অভিনয় দেখে যেমন বলেছিলেন : তোমাদের নৃত্যগীত মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

প্রাণস্পন্দনের বিচারে চিত্রের রেখাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে— নির্জীব, নিপুণ, প্রাণস্পন্দিত বা জীবন্ত। জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর হকুসাই বলেছিলেন শোনা যায়, আমার এই আশি বৎসর বয়সে ছবি আঁকার রীতি-পদ্ধতির মর্মে খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছি মনে হচ্ছে : আরও দীর্ঘ আয়ু যদি পাইতা

枯柴描 又謂柴筆描以銳筆橫卧 為雁大減筆

লেখাঙ্কনরীতির চীনা ছবি। শুক্‌নো ডালের মতো রেখা। ছুঁচোলো লম্বা তুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি টান।

রেখা শুরুতে পেরেকের মাথা আর শেষে ইঁদুরের লেজের মতো। খাড়া তুলির আগাটি পুরাপুরি ছুঁইয়ে, পরে দ্রুত টানে শেষ করা হয়েছে।

牡丹一本同榦二花其紅深
淺不同名品寔兩種也一曰
疊羅紅一曰勝雲紅艷麗尊
榮皆冠一時之妙造化密移
如此褒賞之餘因成口占
異品殊葩共翠柯嫩紅拂拂
醉金荷春羅幾疊數丹陛雲
縷重縈浴絳河玉鑑和鳴鸞
對舞寶枝連理錦成窠東
君造化勝前歲吟繞清香故
琢磨

চীনা । সম্রাট হুই ৎসুঙ্‌'এর লেখা কবিতা । ১১০০-১১২৫ খৃঃ অ.

পারসিক লেখাঙ্কন । লেখক আকা আবদুর রশিদ
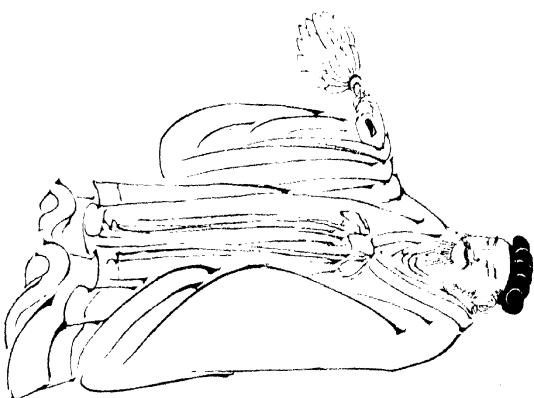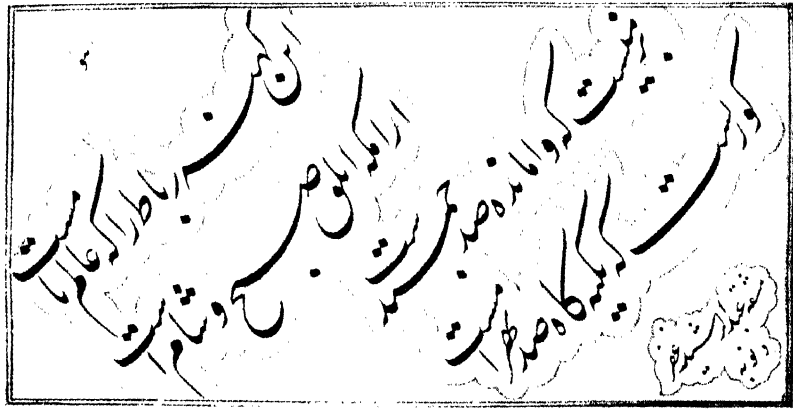
হলে ছবির মতো ছবি আঁকতে পারব আশা হয় ; তখন চিত্রপটে যে ফোঁটাটি ফেলব, যে রেখাটি টানব, সবই কথা কইবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ চিত্রকর এমন রেখা টানতে পারেন যাতে বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর সংশয়, ভয়, অনভিজ্ঞতা আর অস্থিরতা ফুটে উঠেছে ; রেখার দৃঢ়তা, সাবলীল ছন্দ, অব্যাহত গতি ও যথোপযুক্ততা পদে পদে নষ্ট হয়েছে। আর, এমন রেখাও টানতে পারেন যাতে কোনোরকম অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা বা প্রত্যয়ের অভাব দেখা যায় না ; যা পরিণত মন, অভিজ্ঞ দৃষ্টি (পর্যবেক্ষণ) ও অতিশয় দক্ষ হাতের স্বাক্ষর-করা। কিন্তু, আঙ্গিক-সাধনার শেষ সিদ্ধি এখানেও নয়। কারণ, শুধু আঙ্গিকের সাধনায় আঙ্গিকও চরমোৎকর্ষে পৌঁছুতে পারে না। যিনি একাগ্র ও নিরলস ভাবে আঙ্গিকের সাধনাও করেছেন আর শিল্পী হিসাবে যথার্থ রসপ্রেরণারও অধিকারী হয়েছেন, তাঁর তুলির টান কেবল নিপুণ নয়, জীবন্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ? ফলতঃ এরূপ রেখা তুলিকে অনুসরণ করছে বলা চলে না ; বরং আন্তরিক উপলব্ধির দিকে তাকিয়ে বলতে হয়, **রেখাকে তুলি অনুসরণ করছে।** বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মতা থেকে, একান্ত তন্ময়তা থেকে, এপ্রকার প্রাণস্পন্দিত জীবন্ত রেখা সম্ভব হয়। আঁকার আগেই এরূপ রেখা শিল্পীর হৃদয়ে জন্ম নেয়। যেটা আগে থাকতে আছে তাকেই গোচর করা।

নিপুণ রেখা আর জীবন্ত রেখা তু'য়ের প্রভেদ ব'লে বোঝানো যায় না, বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় না।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে 'ধ্বনি'র প্রসঙ্গ আছে। 'ধ্বনি' বলতে ব্যঞ্জনা। সাদাসিধা ভাষায় প্রাণস্পন্দন বললেও আমাদের কাজ চলবে। কারণ, প্রাণ থাকলেই ব্যঞ্জনা আছে ; প্রাণ নেই তো ব্যঞ্জনাও নেই। এখন, আলংকারিকেরা বলেন 'ধ্বনি' অনেক রকমের হয়। অলংকারধ্বনি, অর্থধ্বনি, রসধ্বনি— রসধ্বনিতেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ। ছবিতেও তেমনি রেখা, রঙ, রূপ, প্রত্যেকটির 'ধ্বনি' থাকতে পারে। আর, সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড 'ধ্বনি' বা প্রাণস্পন্দন থাকতে পারে, রসের রূপ হতে পারে— তা রসিকের দৃষ্টিতে ও প্রতীতিতেই ধরা পড়বে। রেখা যেখানে জীবন্ত সেখানে রেখা 'ধ্বনিত' হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্য ছবির প্রাণ হল রেখা। রেনেসাঁ ও তারই ধারাবাহী পাশ্চাত্য ছবিতে রেখা বলতে কিছু নেই ; আলোছায়াই তার প্রাণ।
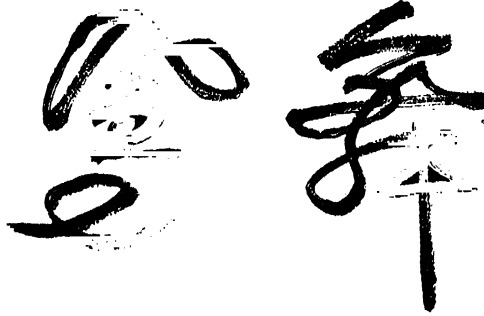
উচ্চারণ : ফ্যাং য়ু ॥ অর্থ : নৃত্যপর ফীনিক্‌স্ ॥ দ্রুত রীতিতে লেখা চীনা লেখাঙ্কন ॥ অধ্যাপক থান য়ুন্‌-শান'এর সৌজন্যে

স্বরাজসাধনা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ তার আদিম জৈব জীবনকে পিছনে ফেলে যত দূরে এগিয়ে আসে ততই সমাজ গড়বার সঙ্গেসঙ্গে সে নানাবিধ দৃশ্য ও অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে। তা না হলে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। দুজন লোক একত্র থাকতে গেলেও উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়, পরস্পরকে বুঝে চলতে হয়। সমাজের বেলায় এ রকম লিখিত ও অলিখিত নিয়মের বাঁধন আরও বেশি, রাষ্ট্রের বেলায় তো আরও বেশি। কারণ, সমাজে অলিখিত নিয়মের প্রাধান্য, রাষ্ট্রে লিখিত নিয়মের। সমাজের নিয়ম-কানুন পারস্পরিক সম্মতির উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভর করে, রাষ্ট্রের বেলায় পলিটিক্সের শাস্ত্রতত্ত্বে সম্মতির কথা যতই বলি না কেন কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার অনুশাসন শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অল্পবিস্তর পরিমাণে শক্তিপ্রয়োগের উপর। কিন্তু এসব নিয়ম সম্মতি বা শক্তি যারই উপর নির্ভরশীল হোক না কেন, এগুলি হল সভ্যতার বিকাশের অনিবার্য উপকরণ। জৈবধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ যত এগিয়েছে তার জীবনধারা ততই এইসব বিধিনিষেধের খাত বয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসে একথাও দেখা যায় যে, এই নিয়মের বাঁধন না গড়ে উঠলে যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং সভ্যতার অগ্রগতিও হয় না তেমনই যখন সমাজের চলবার পথে ঐসব নিয়ম-কানুন অর্থহীন বাঁধন হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই বাঁধনকে ভাঙবার চেষ্টায়, অন্ততঃ সে বাঁধনকে মেজে ঘষে নেবার চেষ্টায়, যে শক্তির জন্ম হয় সেই শক্তিই অগ্রগতির কারণ ও বাহন হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে অবস্থার তারতম্যে এই শক্তির রূপ বিভিন্ন। টয়েনবী দেখিয়েছেন যে, এথেন্সের রাষ্ট্রনায়কেরা সমাজে বিপ্লব বাঁচিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে। আবার এ যুগে মোটামুটি ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত শিল্পশক্তি ও জাতীয়তাবাদ একযোগে চলে বড় বড় শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তার পর শিল্পশক্তি জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল, অথচ জাতীয়তাবাদ বহু ক্ষেত্রে ছোট ছোট সংস্থার মধ্যে এমন চেতনা জাগিয়ে তুলল যে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অখণ্ড সত্তাই উঠল বিপন্ন হয়ে। যে দুটি শক্তি এককালে একদিকে কাজ করেছিল কালক্রমে তারা বিভিন্ন ও বিপরীত দিকে কাজ করতে লাগল। যে যুগে এইসব বিভিন্ন শক্তি পারস্পরিক অভিঘাতেই নিঃশেষ না হয়ে একযোগে কাজ করে সে যুগে ঐ নিয়ম সৃষ্টির সহায় হয়। কিন্তু যখন সে পরিবেশের বদল হয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে নতুন শক্তি সঞ্জাত হতে থাকে অথচ বাইরের নিয়মটা খোলসমাত্র হয়ে থাকে, তখন বাইরের ঠাটটা বজায় থাকলেও প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্য তখন তার চতুঃসীমার মধ্যে সৃজনধর্মিতা আর বজায় থাকে না, ভিতরে ভাঙনের ধারা প্রবল হয়ে ওঠে।

যখনই সমাজে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক জীবনে এ রকম দুর্লক্ষণ দেখা দেয় তখনই প্রায় জৈবিক নিয়মেই সেই দুর্লক্ষণ প্রতিরোধ বা অপসারণের শক্তি জন্মাতে থাকে। হয়তো এই সংঘর্ষে এক এক সময় ভাঙনটাই খুব বড় হয়ে ওঠে, চারদিকে অবিশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে। যেমন একালের সাহিত্যে বইছে,

অনেক সময় সমাজেও। কিন্তু ইতিহাসের বিস্তৃতকাল আলোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙাচোরা ক্ষয়ক্ষতি লোকসানের মধ্য দিয়ে আর-একটা নতুন ভূসংস্থান জেগে ওঠে। একথা যদি সত্য না হত তাহলে মানবসমাজ এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন অবিশ্বাসী কবিদের ব্যঙ্গ ও বৈহাসিকতার পর রোমান্টিক কবিরা উদ্দীপন আশার সঞ্জীবনমন্ত্র আগুনের ফুল্‌কির মত ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন; বা এদেশে সমাজের বন্ধনজর্জরতার শেষ সীমায় রবীন্দ্রনাথ অবুদ্ধির উৎপীড়ন হতে মুক্ত চিত্তের স্বারাজ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যের নতুন ধারায় দেশকে প্লাবিত করতে পেরেছিলেন। যুগে যুগে এ রকম ঘটছে— সময় সময় নতুন-জেগে-ওঠা শক্তি খুব বৃহৎ এবং গভীর হয়, তার চিহ্ন মহাকালের খাতায় স্থায়ী হয়, আবার সময় সময় সে শক্তি কেবল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রাচীন যুগের তুলনায় কিন্তু এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। সেকথা আলোচনা করতে গিয়ে টয়েনবী বলেছেন, আগের যুগে বিভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা নিজের জগতের মধ্যেই মশগুল হয়ে থাকত, বাইরের দিকে বড় একটা তাকাত না। কিন্তু এ যুগের বিশেষত্ব হচ্ছে শুধু যে বস্তুজগতেই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ঘনসংশ্লিষ্ট তাই নয়, মনোজগতেও তারা ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।[১] শুধু দূরদূরান্তরে সহজে যাতায়াত ও লেনদেন ব্যাবসাবাণিজ্যের ফলেই এটা ঘটে নি; মানসিক হাওয়াবদলও ঘটেছে, চেতনা নতুন পথে সঞ্চারিত হচ্ছে। পশ্চিম দেশে যখন লিবরলিজ্‌মের স্রোত শুরু হয়, মানবিক অধিকারের প্রসার চেষ্টার আরম্ভ, তখন তা য়ুরোপের লোকদের চিন্তা করেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু জগতের বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ প্রাচ্যভূখণ্ড, হতে রস আহরণ করে তাঁদের সমৃদ্ধি, এবং মানবিক অধিকারের দাবী সেই কারণে যে তাদেরই সর্বাগ্রে— একথা তাঁদের কারও স্মরণ হয় নি। কবির ভাষায়, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। এই কথাটা য়ুরোপ মর্মান্তিক বেদনার সঙ্গে প্রাচ্য ভূখণ্ডকে অনুভব করিয়েছে। আজ সেজন্যই অবস্থা বদলেছে। একালের বিধ্বস্ত সমাজে পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব ওদেশে রচনা করতে হলেও খালি য়ুরোপের কথা ভাবলে চলে না, গোটা জগতের কথা ভাবতে হয়। এসব দেশকে বাদ দিয়ে কোনো তত্ত্বকথাই ভাবা চলে না। আগে যা স্থানীয় শক্তি হলে চলত এখন তা বিশ্বশক্তি, অন্ততঃ ব্যাপক শক্তি হবার প্রয়োজন ঘটেছে।

এই রকম পরিবর্তনের আসল কারণ হল, সারা বিশ্ব এখন মনোজগতে বা বস্তুজগতে এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত যে কোনও জায়গায় সংকট দেখা দিলে সে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বিশ্বসংকটে পরিণত হয়। অবশ্য, মৌলিক সংকট হলে। আর, একথা তো সকলেই অনুভব করেন যে আমরা বর্তমানে এ রকম একটি গভীর মৌলিক সংকটে এসে পৌঁছেছি। ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে, গত দু শো বছর ধরে সমাজ যে মানসিক ও

---

১ "In the new age, the dominant note in the corporate consciousness of communities is a sense of being parts of some larger universe, whereas, in the age which is now over, the dominant note in their consciousness was an aspiration to be universes in themselves. This change indicates an unmistakable turn in a tide, which, when it reached high-water mark about the year 1875, had been flowing steadily in one direction for four centuries."—Toynbee, *Study of History* vol I. p 15.

অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পড়োপড়ো হয়েও কোনো রকমে এতকাল দাঁড়িয়ে ছিল আজ সে ভিত্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস—নতুন করে ভিত্তিরচনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জগতের অন্যান্য দেশেও এ রকম অবস্থা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় নতুন শক্তি কি রূপ নেবে ?

২

উপরি-উক্ত প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাবই সম্ভব নয়, কেননা তা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে গত শতাব্দীর নিরাকার চিন্তাধারা এই শতাব্দীতে সাকার সাম্যবাদে পরিণত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সে জিনিসটা জগতের মনকে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তার কর্মপদ্ধতি বা ক্রিয়াকৌশল সব জায়গায় সমান নয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি রুশিয়ায় যে ভূমিব্যবস্থা করা হয়েছে চীনে তা থেকে কিছু পৃথক ভূমিব্যবস্থা করা হচ্ছে। পূর্ব-য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এ রকম কিছু কিছু তফাত আছে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির কথা বলছি না। এই রকম ছোটোখাটো পার্থক্য ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে, তাঁদের কতকগুলি মূল কথা আছে যা সর্বত্রই এক। একথাও অস্বীকার করতে পারি নে যে ইতিহাসের গতি নির্ণয়ে তাঁদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অর্থনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বাস্তব ও সুনিপুণ, দশ বছরের পথ এক বছরে হাঁটতে তাঁরা সক্ষম। শুধু যে নিজেরাই সক্ষম তাই নয় ; এই আদর্শের নামে কিছু লোকের মধ্যে প্রায় ধর্মোন্মাদের মত উৎসাহ সৃষ্টি করে, আর কিছু লোকের উপর অসংকোচে বলপ্রয়োগ করে তাঁরা দেশটাকেও অনেকখানি দ্রুত হাঁটাতে সক্ষম। এ ছাড়া আরও নানা তর্কের বিষয় আছে, যা এখানে অবান্তর। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হল, মানুষ নয়, রাষ্ট্র। সেইজন্য সাম্যবাদীর কর্মকাণ্ডের প্রথম লক্ষ্যই হল রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করা ; শুধু দখল করা নয়, শোষকদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সবলে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার চিহ্নমাত্র না রেখে একেবারে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপনা করা। স্টালিন একথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রচলিত অর্থে ডিমোক্রেসি নয়, সেখানে সত্যকারের মেজরিটি রাজত্ব করবে মাইনরিটির উপর। মাইনরিটি হল শোষক সমাজ, তাদের বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেই হবে। পারী কমিউনের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স বলেছেন, তার প্রধানতম কারণ হল সেখানে কর্তারা পুরোপুরি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে কিছু কিছু পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র রেখে তার সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের খানিকটা ভেজাল দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য এই তত্ত্ব অনুসারে যে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে একেবারে সর্বগ্রাসী, তার বাঁধা ছকে সারা দেশটার সকল মানুষের জীবন বাঁধা। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে রাষ্ট্রকে দৃঢ় ও পুষ্ট করবার চেষ্টায় মানুষকে ছককাটা পথে পরিচালিত করা। এ পথে হয়তো শোষক শ্রেণী আর থাকবে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হয়তো হতে থাকবে, কিন্তু সেসবই হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকায়। ব্যক্তিমানুষ তাতে পিষ্ট। সেই চাকা চালানোতেই তার একমাত্র সার্থকতা, তার বাইরে তার প্রয়োজন নেই। উৎকর্ষের মানদণ্ড হল সেই চাকা কে কত ভালো ভাবে চালাতে পারছে। রাষ্ট্রনায়কদের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার আগ্রহ এত বেশি যে দেশের প্রত্যেকটি লোক সেটি বোঝা ও সে সম্বন্ধে উৎসাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর যাঁরা তাতে সায় দেবেন না তাঁদের উচ্ছেদই হল সেই স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার সিধে পথ। ও বলিদান পাপ তো নয়ই, বরং ধর্ম। যাঁরা ও বলিদানে ভীত তাঁরা এই শক্তিপূজার তন্ত্রধারক হবার অযোগ্য।

এ পথ ভালো কি মন্দ সেসব তর্ক এখানে অবান্তর। একথা সত্য যে, এখন এ পথ জগতে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বাস্তবিকই, যে সময় মানুষের দুঃখকষ্ট সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায় সে সময় সে ক্রূর কঠোর ভয়াল হয়ে ওঠে। তখন এই রকম রুক্ষ অবিমিশ্র কেজো কথাই তার মন সম্পূর্ণ দখল করে নেওয়া স্বাভাবিক। হিতবচনের চেয়ে কর্মোদ্যমই তার প্রিয়। আর যদি সহজে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় তাহলে তার অনিবার্য উপায়স্বরূপে সে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরাট্ চাকার মধ্যে স্বেচ্ছায় অঙ্গীভূত হতে আপত্তি করে না, বরং বিশ্বাস করে এই পথেই তার আদর্শসিদ্ধি, এমন কি উৎসাহেরও অভাব বোধ করে না।

৩

আজকের দিনে আমাদের দেশে স্বরাজসাধনার উপায় স্বরূপে এই পথ ভালো কি মন্দ সে কথা আলোচনা না করলেও মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে আমরা একটা নতুন পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেছি। তার প্রবর্তক হলেন গান্ধীজি। সাধারণ পলিটিশ্যনদের লক্ষ্য গোটা মানুষ নয়। মানুষের জীবনের যেটুকু রাজনীতির আওতায় পড়ে সেইটুকু নিয়েই তাঁদের কারবার। যে লোকটা তাঁদের ভোট দিয়ে গেল সে লোকটার জীবনাদর্শ কি, ব্যক্তিগত চালচলন কেমন, এসব অবান্তর কথা নিয়ে তাঁদের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ স্বরাজসাধনা আর জীবনসাধনা এঁদের তত্ত্বে সমীকৃত হবার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র রাজনীতি নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত, তার বাইরে যাবার দরকার তাঁরা অনুভব করেন না। সাম্যবাদ বোধ হয় তার প্রথম ব্যতিক্রম, কেননা তারা শুধু ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, মানুষের সারা জীবনটাকে একটা যান্ত্রিক ছন্দে বেঁধে দেবার চেষ্টাও করে। কিন্তু গান্ধীজি হলেন এ দুয়েরই ব্যতিক্রম। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল মানুষ। রাজনীতির আপাত লাভক্ষতি তিনি এই মানদণ্ডে যাচাই করে দেখেছেন। স্বরাজ-লাভের চেয়েও স্বরাজলাভের উপযুক্ত মানুষ তাঁর চোখে বড়। চৌরীচৌরার পর আন্দোলন বন্ধ করা হতে এই ধরনের বহু সিদ্ধান্তের মূল এইখানে। তিনি জানতেন এ দেশের মানুষকে স্বরাজলাভের উপযুক্ত করে তুলতে পারলেই আপনা-আপনি শৃঙ্খল খসে যেতে বাধ্য। আর তা না হলে যদি কেউ এসে একবার তার শৃঙ্খল খুলেও দেন, পরক্ষণেই সে আবার কারও কাছে শৃঙ্খল পরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। আর যে দেশে অগণিত মানুষ এ রকম শক্ত বুনিয়াদে নিজেদের গড়ে তুলেছে সে দেশে স্বরাজের ভিত হবে পাকা। মুক্তধারার ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের সে লজ্জা রাখবার স্থান ছিল না। সে বলেছিল "আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তাহলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।" একজন লোক যদি মহা শৌর্যে-বীর্যে সারা দেশের জন্য স্বরাজ এনে দেয় তাহলে তার কৃতিত্ব অপরিসীম হল বটে, কিন্তু সে স্বরাজ দেশের লোকের জন্য হল না, সে হয়ে রইল একজনের উপর নির্ভরশীল, পঙ্গু। এতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। একজন মানুষ, তিনি যত বড়ই হোন্ না কেন, দেশকে চিরকাল কখনও রক্ষা করতে পারেন না। আর পারলেও সে অবস্থায় দেশের লোকের কোনো স্বরাজই হল না, তারা ইংরেজের বদলে আর-একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল, চিন্তায় কর্মে মনে। সেই জন্য গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল মানুষ, যে মানুষের জীবনে স্বরাজসাধনা ও জীবনসাধনার সমীকরণ হবে। ধর্মযাজকেরা যুগে যুগে এ রকম চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা সমাজ বা রাজনীতির ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করে। গান্ধীজিই হলেন প্রথম পুরুষ যিনি গুহাহিত তপস্যার জন্য নয়,

দৈনন্দিন রাজনীতির সক্রিয় উপায় হিসাবেই এই মানুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাজনীতির চাতুরিভরা ছলনাময় রঙ্গমঞ্চে এ রকম অদ্ভুত চেষ্টা এর আগে হয় নি। এইখানে তিনি সাধারণ পলিটিশ্যনের ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে তিনি কেজো লোক হলেও মুক্তিসাধনার শর্টকাট হিসেবে মানুষকে যান্ত্রিক চেষ্টার অঙ্গীকৃত হতে দিতে চান নি। যেখানে মানুষকে সজ্ঞান কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মিলিত করতে পারা যায় না সেখানেই তাকে অজ্ঞান বাধ্যতায় জোর করে জুড়তে হয়। মানবচরিত্রের ওরকম পরিবর্তন সম্ভব নয়, অথবা ওরকম পরিবর্তন ঘটাবার জন্য যে সময় ও যে চেষ্টা প্রয়োজন তাতে মজুরি পোষানো সম্ভব নয়— এ বিশ্বাস থাকলে কর্তৃপক্ষ অজ্ঞান বাধ্যতার পথই বেছে নিতে বাধ্য। কিন্তু তা হতে প্রমাণিত হয় না যে যদি সজ্ঞান কর্মচেষ্টার সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হত তা হলে তাতে আরও ভালো ফল ফলত না। মুক্তধারার যন্ত্ররাজ বলেছিল, তাঁর বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আল্‌গা করতে পারে এমন পথ খোলা নেই। উত্তরে দূত বলেছিল, ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না, তাঁর জন্য যেসব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না। সুবৃহৎ যন্ত্রের বিপদই এই ; একবার ফাটল ধরলে তাকে আর ঠেকানো যায় না। সেইজন্য সন্দেহ বা অবিশ্বাসের এতটুকু চিহ্ন দেখা গেলেই তাকে তখনই সবলে অপসারণ করতে হয়। তাছাড়া সমাজ মুক্তির স্বর্গরাজ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছেছে একথা বিশ্বাস করলে সেখানেই সমাজের গতি রুদ্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ, সামাজিক জৈবধর্মে যে নতুন নতুন শক্তির সৃষ্টি হতে থাকে সে শক্তির উৎসমুখ যদি খোলা থাকে তাহলে সমাজের ফের বদল ঘটবেই। কিন্তু সমাজ তার বিকাশের চরমতায় পৌঁছেছে যদি একথা বিশ্বাস করা হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যদি সেখানেই তাকে আটকে রাখে তাহলে আবার নতুন শক্তির জন্ম বা নতুন পরিবর্তনের সূচনা অনভিপ্রেত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক যে সমাজে আর নতুন শক্তি যেন না জন্মায়। সমাজে নতুন শক্তি না জন্মালে রাষ্ট্রেরও আর কোনো বদল ঘটতে পারে না, সেইজন্য সে অবস্থায় রাষ্ট্রের শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তরই নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে একজায়গায় এনে সেখানেই চিরকালের মত স্তব্ধ করে রাখবার চেষ্টা বোধ হয় সম্ভব নয়— সম্ভব হলেও, স্বাভাবিক নয়। অথচ যদি যান্ত্রিক ভিত্তির বদলে সচেতন সজ্ঞান খাঁটি মানুষের জোড় মেলাতে পারা যায় তাহলে সে বুনিয়াদে শুধু যে ফাটল ধরবার আশঙ্কাই কম তাই নয়, তাতে ফল আরও ব্যাপক আরও গভীর এবং আরও স্থায়ী হবে। গান্ধীজি জানতেন যে, এভাবে মানুষকে গড়ে তোলা সহজ নয়। কিন্তু অন্য সহজ পন্থা ত্যাগ করে তিনি এই মহাযানের পথিক হতে দ্বিধা করেন নি, কারণ মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল দুর্মর। এইখানে তিনি সাম্যবাদের চলিত পন্থারও দারুণ ব্যতিক্রম। আর তাঁর শেষ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি এসব কথা অবাস্তব ধর্মোপদেশ হিসেবে বলেন নি, কাজের পদ্ধতি হিসেবেই বলেছিলেন এবং সে পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফললাভও করেছেন।

৪

আজ যখন স্বরাজসাধনা আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু হয়ে উঠেছে তখন ভাবতে হবে এই স্বরাজসাধনার সফলতার জন্য কি রূপ দরকার। স্বরাজলাভের সাধনার সময় আমাদের পারস্পরিক বন্ধন ছিল প্রধানতঃ পরবশতার হাত হতে মুক্তির চেষ্টা। সারা ভারতবর্ষ ক্রমশঃ এই সূত্রে বাঁধা হয়েছিল। এক হিসেবে

মুক্তিপ্রচেষ্টার এই রূপও ইংরেজ সাম্রাজ্যের ফল। ভারতবর্ষে বহু সাম্রাজ্য হয়েছে এবং গিয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড সত্তার ধারা চলে এসেছে। কারণ, এইসব সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে পোলিটিক্যাল সংহতির মধ্যেই সংহত করতে চায় নি, করতে চাইলেও পারে নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে মিল ছিল পোলিটিক্যাল সূত্রে নয়, সমাজের স্তরে। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে বলেছিলেন। আমাদের যেখানে যেখানে মিল ছিল সে মিল পোলিটিক্যাল বন্ধনের ফলে সৃষ্টি হয় নি। সমাজের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল বলেই সে মিল এইসব সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের মধ্যেও টিকে থাকতে পেরেছিল। সেইজন্যই একসময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার সংঘাত, কবিরই ভাষায়, এক বিচিত্র ব্যাপার। একহিসেবে অনন্যও। শুধু যে তারা আমাদের চিত্তের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার এনেছিল তাই নয়, সঙ্গেসঙ্গে আমাদের সমাজের ধারাটিও দিল বদলিয়ে। এতদিন ধরে আমাদের সমাজ যে সূত্রটি ক্ষীণভাবে ধরে রেখেছিল সে সূত্রটি এই নতুনতর সভ্যতার সংঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। সেইজন্য একদিকে যেমন সাম্রাজ্যিক কাঠামোর চাপে আমাদের দেশে এবং সমাজে মোটের উপর দেখা দিল ভাঙন, তেমনই অন্যদিকে আমাদের চিন্তাভাবনা সমাজের স্তর হতে চলে গেল পলিটিক্সের প্রস্থানভূমিতে। একথা সত্য যে, ইংরেজী সভ্যতার সংঘাত আমাদের চিত্তবৃত্তির বিকশনে যেমন সাহায্য করেছে তেমনি কোনো কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমাজসংস্থানেও জাগিয়েছে নতুন শক্তি। এইরকম শক্তির ফলেই বাংলায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলে গত দু শো বছরের ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভাঙনের ধারাই মোটের উপর ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই ধারার প্রসার নিবারণ করে সমাজের শক্তিকে নতুন রূপে জাগরিত করবার কোনো চেষ্টাই তার মধ্যে ছিল না। ইংরেজ রাজত্ব আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁধনে বেঁধেছিল, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেষ্টাতেও আমরা তেমনই প্যোলিটিক্যাল মঞ্চেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এ বাঁধন যে কত ঠুন্‌কো তা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আমলেও হিন্দুমুসলমানের মনকষাকষি উপলক্ষ্যে বার বার বলেছিলেন। শুধু হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধেই একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলে এসেছেন। "কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সাড়া যখন পাই না তখন রাগ হয়। মনে হয় এই যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্য মাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উলটা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।"[২] কিন্তু এই দুর্বলতা পরের যুগেও সংশোধিত হয় নি। উপরন্তু এই মূলগত দুর্বলতা সংশোধনের চেষ্টা না করে আমরা সেটা চাপা দিতে চেয়েছি প্রলোভন দেখিয়ে। তাতে নিজেদেরও হিত হয় নি, অপর পক্ষেরও নয়। বরং আসল ব্যবধান আরও দুস্তর হয়েছে। খিলাফৎ-প্রসঙ্গে এইজন্যই কবি লিখেছিলেন, "অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা

---

২ সমূহ।

সত্যতঃ মিলি নি; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্য দল পশ্চিমমুখ হয়ে, কিছুক্ষণ পাশাপাশি- পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না।" কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এদিকে কেউ নজর দেন নি। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসও এ কাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নি। কারণ, গান্ধীজির পক্ষে মানুষের সাধনা ছিল নীতি, কংগ্রেসের পক্ষে তা কৌশলমাত্র। সেইজন্য আমাদের স্বরাজলাভের সাধনার ধারা গড়িয়ে চলেছিল কেবলমাত্র পলিটিক্‌সের পথ ধরে। অসফলও হয় নি, তার কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাঁধনটাও ছিল পোলিটিক্যাল সূত্র ধরেই।

স্বরাজলাভের সাধনা স্বরাজসাধনায় পরিবর্তিত হবার সঙ্গেসঙ্গে মূল প্রশ্নটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র পলিটিক্‌সের পথ ধরে আমরা স্বরাজসাধনার পথে অগ্রসর হতে পারব কি না। বিশেষতঃ এই চার-পাঁচ বছরেই আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজবিতাড়নের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁধনের জোড় আলগা হয়ে পড়ছে। ভাষাগত বিরোধ, প্রদেশগত বিরোধ— এসব তো আছেই। সেইসঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে যে অনৈক্যের মূল পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল তা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অনৈক্যের প্রধানতম অবশ্য অর্থনৈতিক অনৈক্য। আর্থিক প্রসারের যুগে এটা তত পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু এযুগের মত আর্থিক সংকোচনের সময় তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে, ক্ষীয়মাণ রসধারার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হতে থাকে। তবুও ঐ অনৈক্য একেবারে পুরোপুরি অর্থনৈতিক নয়। এই কাঞ্চনকৌলীন্যের যুগেও অন্য ধরনের অনৈক্য একেবারে মরে নি; বিশেষতঃ যেসব দেশে অবুদ্ধি অবিদ্যা অনেকদিন ধরে রাজত্ব করে এসেছে সে দেশে তার জড় মরে সম্পূর্ণ কাঞ্চনকৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হতে সময় লাগে। সমাজ এবং ধর্মের নাম দিয়ে দুঃখ এবং অপমানের বেদনা অর্থনৈতিক বেদনার চেয়ে আমাদের দেশে আজও কম দুঃসহ নয়। এই ধরনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনৈক্যের মূল রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে। এই বাস্তব সত্যকে চাপা দিয়ে কেবল পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে মিলন ঘটাতে গেলে সে মিলন সত্যও হতে পারে না, স্থায়ীও নয়। বিশেষতঃ য়ুরোপের মত এদেশে অন্য চিন্তাভাবনা দূরে সরিয়ে রেখে কেবল পলিটিক্‌সের স্তরে চিন্তা করার অভ্যাস আমাদের বেশি দিনের নয়। য়ুরোপ বহুদিন থেকে অন্য সবরকম সংস্কারকে ভাঙতে ভাঙতে আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে সমস্ত কুসংস্কার ভাঙবার অজুহাতে তারা সকল সংস্কার ভেঙে আস্তিক্যবুদ্ধিরই বিলোপ ঘটিয়ে বসেছে, আজ তারা বরং আস্তিক্যবুদ্ধির সন্ধানেই ব্যতিব্যস্ত। আমাদের দেশে ভালো হোক মন্দ হোক নানা রকম সংস্কার বা সংস্কারের অপভ্রংশ আজও জীবন্ত সত্য। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সমাজের অসমতা। এ অবস্থায় কেবলমাত্র পোলিটিক্যাল স্তরে দেশটাকে বেঁধে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা বাস্তববুদ্ধির বা কর্মকৌশলের পরিচয় নয়।

তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাববার আছে। য়ুরোপের দেশগুলির মত ভারতবর্ষ ছোট দেশ নয়। সেখানে কেন্দ্রস্থ শাসনব্যবস্থার উৎসমুখ থেকে যে ধারা উৎসারিত হয় তা সীমানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সহজেই। আমাদের দেশের পক্ষে সে কথা সত্য নয়। এই বিরাট দেশে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র থেকে

যে ধারা বইয়ে দেওয়া হয় তা পরিধি পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায়ই শুকিয়ে যায়, সীমানায় শেষ পর্যন্ত তার আর কোনও চিহ্নও বহুসময়ে থাকে না। এ রকম বৃহৎ দেশ যান্ত্রিক ছন্দে বাঁধা থাকলে কেন্দ্র হতে পরিধি পর্যন্ত ধারাস্রোতের যাত্রাপথে নানা জায়গায় পাম্প বসিয়ে তাকে জোর করে চালাবার চেষ্টা বরং সম্ভব। কিন্তু সে যান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকলে নির্ভর করতেই হবে মানুষের উপরে। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় উপযুক্ত খাত কেটে সেই ভাগীরথীর ধারাকে বইয়ে নিয়ে যায় তাহলে যন্ত্রের অভাবে কোনো ক্ষতি হয় না। বরং আরো ভালো ফল হয়।

আজ স্বরাজসাধনার মূল প্রশ্ন এইখানেই। আমরা প্রথমতঃ দেশটাকে যতই পলিটিক্সের বজ্র-বাঁধনে বাঁধতে চাচ্ছি, সর্বত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র স্থাপনার চেষ্টা করছি, আমাদের সেই সৎ ও মহৎ প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফল লাভ তো করছেই না, বরং দিন দিন নানারকম অনৈক্য জোর হয়ে উঠছে। আসল গলদ ঐখানে; সেগুলিকে না সরিয়ে জোড়াতালি দিয়ে শুধু পোলিটিক্যাল ঐক্যের বন্ধন এ অবস্থায় কখনোই সফল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতালাভের পর থেকে নানা জনহিতকর প্রচেষ্টাও আশানুরূপ ফললাভ করছে না, তারও কারণ কেন্দ্র থেকে পরিধিতে পৌঁছতে পৌঁছতেই সে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— মাটি উর্বর করতে পারছে না, ফসলও ফলাতে পারছে না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় মাত্র দুটি। প্রথমতঃ, সারা দেশটাকে অনড় কঠিন যান্ত্রিক ছন্দে বেঁধে এ হতে মুক্তিলাভের চেষ্টা হতে পারে; যে যন্ত্র আমাদের নানারকম অনৈক্য স্টীম-রোলারের মত গুঁড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে সবলে এক নতুন বাঁধনে আমাদের দেশকে বেঁধে রেখে সজোরে সামনের দিকে চালাবার চেষ্টা করবে এবং সেইসঙ্গে কেন্দ্র হতে উৎসারিত ধারাকে যান্ত্রিক শক্তিতে সীমানা অবধি পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমরা যদি সেই পদ্ধতি লাভক্ষতির বিচারে শ্রেষ্ঠতম, অর্থাৎ পরিণামে সব চেয়ে লাভজনক, বলে মনে না করি তা হলে মানুষের দিকে চোখ ফেরানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

গান্ধীজি আগে থেকেই এই অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কেবল মানুষের কথাটাই বড় করে বলতে চেয়েছেন। হাতেকলমে স্বরাজসাধনা করবার আগে আমাদের কাছে এই সমস্যাটা স্পষ্ট হয় নি, সেইজন্য গান্ধীজির কথাও অনেক সময় আমাদের কাছে অবাস্তব ঠেকেছে। কিন্তু হাতেকলমে স্বরাজসাধনা করতে গিয়ে আমরা ক্রমেই এই সমস্যার গভীর গহনে প্রবেশ করছি। তথাকথিত গান্ধীবাদীরা গান্ধীজির কথাবার্তাকে একেবারে অনড় শাস্ত্র বানিয়ে তার সূত্র ভাষ্য নিয়ে নৈয়ায়িকদের মত যেসব তর্ক করেন সেসব তর্ক একেবারেই অবান্তর। এমনকি বিশেষ কোনো অবস্থায় গান্ধীজি যেসব পথ নির্দেশ করেছেন সেসব পথই যে চিরকাল পরিবর্তনহীন ভাবে চালাতে হবে, এমন চিন্তাও বাস্তব নয়। যেমন চরখার কথা, খাদির কথা। কিন্তু এইসব তর্কে আসল কথাটা ভুললে চলবে না। উপায় নিয়ে যতই তর্ক হোক উদ্দেশ্যটা মনে রাখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যটা হল, আজ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যদি সজীব প্রাণবান এবং শোষণবর্জিত সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে তার সমবায়ে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, শুধু কেন্দ্রীভূত বিরাট ক্ষমতার অধিকারী যান্ত্রিক রাষ্ট্র উপর থেকে বলপ্রয়োগ করে তেমন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রটা গড়ে তুলতে হবে পিরামিডের মত তলা থেকে উপর পর্যন্ত। উল্‌টো পিরামিডের মত উপর থেকে শুরু করে তলা পর্যন্ত নয়, কারণ তাহলে সেটা আসলে ঊর্ধ্বমূল অবাঙ্‌শাখ বৃক্ষের মতই ঝুলতে থাকবে, বাইরে তার শক্তির আড়ম্বর ও মত্ততা যতই থাক্‌ না কেন।

আমাদের স্বরাজসাধনার এই সমস্যাটি ভালো করে উপলব্ধি করলে চিন্তা করতে হবে, সেই নতুন সমাজ কি ভাবে গড়ে তোলা যায়, কি-ই বা তার আদর্শ। এবিষয়ে গান্ধীজি তাঁর গঠনকর্মপদ্ধতিতে এবং অন্যান্য রচনায় বহু নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন মানুষ গড়বার আগ্রহ তাঁর সর্বত্র, সেই মানুষের ভিত্তিতেই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। আর, সে সমাজ হবে বিকেন্দ্রীকৃত, কারণ কেন্দ্রীকরণ হলেই তার জীবনছন্দ বিচিত্র মিলে মিলিত না হয়ে যান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এই হল তাঁর মূল কথাটা, তাঁর সূত্রকারেরা হিংসা-অহিংসা শিল্প-কুটিরশিল্প প্রভৃতি নিয়ে যতই তর্ক করুন না কেন। এবং আজকের দিনে এবিষয়ে চিন্তা করতে হলে আমাদের সেই মূল কথাটাই ভাবতে হবে, সূত্রভাষ্যটীকার গহন অরণ্যে হারিয়ে গেলে চলবে না।

সেইজন্য এই কথাটা ভাবতে গেলে আরও একটা কথা না ভেবে উপায় নেই। টীকাকার-ভাষ্যকারেরা তাঁদের কলহ-কোলাহলে আসল কথাটাকে ঘুলিয়ে তুলুন বা নাই তুলুন, গান্ধীজি মানুষের নবজন্ম চেয়েছিলেন বটে, ভাস্বর শুদ্ধাচারে তার জীবনসাধনা ও স্বরূপসাধনা সমীকৃত করতে চেয়েছিলেন একথাও সত্য, তবু তাঁর কল্পনার মানুষও মানুষের মহত্তম বিকশনের আদর্শ স্বীকার করে নি। তার সত্তাও বহু জায়গায় খণ্ডিত ও সীমাচিহ্নিত। সেকথা সবচেয়ে ভালো করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সত্যের আহ্বান' এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রবন্ধে। আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষ চাই তাহলে তার পূর্ণ বিকাশ চাই। সে অবস্থায় তার মন যদি ইংরেজের শিকলে বাঁধা না পড়ে চরকার শিকলে বাঁধা পড়ে, সে যদি মনে করে যে যন্ত্রের মত চরকা ঘুরিয়ে গেলেই একদিন আপনা-আপনি স্বরাজ এসে উপস্থিত হবে তাহলে বুঝতে হবে তার মনটা তেমনই অনড় আছে, কেবল তার বশ্যতা একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে বদল হয়েছে মাত্র। কবির ভাষায় এ ঢেঁকির মনিব-বদল মাত্র, যেই তাকে চালাক না কেন, সে পাড় দিতেই থাকবে। আসলে তার ঢেঁকিজন্ম থেকে মুক্তি চাই। সুতরাং আজ যখন মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই আমাদের ধর্ম তখন সে মানুষ শুধু উজ্জ্বল ভাস্বর ক্লেদলেশহীন হলেই হবে না; শুধু জীবনটিকে সে তপস্যার মত ধারণ করে জীবনসাধনা ও স্বরাজসাধনাকে একীকৃত করলেই হবে না; তার সঙ্গে দেখতে হবে তার আদর্শে কোনো খাদ নেই, তার মন হতে জড়তা দূরীভূত। অন্ধ বাধ্যতা কারও কাছেই ভালো নয়— ইংরেজ মহিমার কাছেও নয়, এদেশের অতীতযুগের বিচারহীন গুণগানেও নয়, কোনো স্বদেশী ফরমুলার কাছেও নয়, কারণ ও হল যান্ত্রিকতারই বিভিন্ন রূপ। যে মানুষ পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপরের সঙ্গে নতুন সমাজরচনার চেষ্টায় সাগ্রহে মিলিত হয় সেই সজ্ঞান ও সাগ্রহ মিলন ও কর্মচেষ্টার চেয়ে ফলবান আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, "দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে।· ·দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকে ছোটো করা হবে।· ·স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। স্বাস্থ্যের সঙ্গে,

বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই।"[৩] কি উপায়ে সেই রূপটির প্রতিষ্ঠা হতে পারে তা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন, আমাদের অবিদ্যা অবুদ্ধি দূর করে চিত্তের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে— যে চিত্ত পাঁজি মনসা ওলাবিবির কাছে বিক্রীত নয়, যে চিত্ত মুসলমানকে শুধু রাজনীতির বেলা ভাই বলে আহ্বান করে মানবিক অধিকারের বেলা দূরে ঠেলে রাখে না, রাজনৈতিক সভায় চাষীদের জন্য বক্তৃতা দিয়ে ঘরে এসে তাদের 'চাষা বেটা' বলে না। সেই সঙ্গে আমাদের সাধনা করতে হবে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাধনা— যা মানবসত্তাকে খণ্ডিত ও সীমাচিহ্নিত আদর্শের দিকে টেনে না গিয়ে পরিপূর্ণ ভালোর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আর, সেই সঙ্গে আরও চেষ্টা করতে হবে, "জীবিকার ভিতের উপর একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার"। "জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে— মরণের ডাকের মতই এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়— যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য, তাহলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারব। তা ছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাব অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।" এইভাবে চলতে পারলে একদিন-না-একদিন ব্যক্তিমানুষের এই ধর্ম রাষ্ট্রেও প্রতিফলিত হবে। কারণ, "ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকেরা বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্যন্ত এমনিই চলছে। যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন, কেননা পরস্পর-নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যেসকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে।"[৪] এইজন্যই জীবনসাধনা ও স্বরাজসাধনার সমীকরণ চাই, ব্যক্তিক জীবনেও, রাষ্ট্রের জীবনেও। তারই পূর্ণতম আদর্শের মহত্তম সাধনাই স্বরাজসাধনা। এই পথেই আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তা না হলে সত্যের আবির্ভাবের যে অন্য পথ তা কুটিল, ভয়াল এবং রক্তপিচ্ছিল।

---

৩ কালান্তর: স্বরাজসাধনা।

৪ কালান্তর: চরকা।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঋষি, রবীন্দ্রনাথ আচার্য। মহর্ষির পুত্র তিনি; আজন্ম ধর্মের আবহাওয়াতেই তাঁর জীবন পরিবর্ধিত। রামমোহন রায়ের সময় থেকে ধর্মের যে নবজাগরণ দেশে দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার মূল গভীরভাবে নিহিত ধর্মের মধ্যে। সে ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকে ঠিকভাবে বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু যে ধর্মের তিনি সাধক ও উদ্গাতা, যে ধর্মের ভিত্তির উপরে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, সে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তো একেবারেই অসম্ভব। এ স্থলে আমরা রবীন্দ্রস্বীকৃত ধর্মের বিশেষ একটি দিকের একটুখানি পরিচয় দিয়েই নিরস্ত হব।

১

সব মানুষেরই একটি জন্মগত ধর্ম থাকে। তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস স্বাধীন বিচারবুদ্ধির অনুযায়ী নয়, জন্মলব্ধ ধর্মেরই অনুযায়ী। সে ধর্ম আবার গোষ্ঠী- বা সম্প্রদায়- গত। তাই দেখি পৃথিবীর সব মানুষই বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ইসলাম, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি কোনো-না-কোনো সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের জন্মলব্ধ ধর্ম ব্রাহ্মধর্ম; আদি-ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। দীর্ঘকাল তিনি উৎসাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের গুণকীর্তন এবং পক্ষসমর্থন করেছেন; আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কর্তব্যভারও বহন করেছেন অনেক কাল। কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকবার মতো মন নিয়ে তিনি জন্মান নি। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই (১৮৯৭) যিনি বলেছিলেন—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর,
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?"

তাঁর মুক্তিকামী চিত্ত যে দীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সীমায় বন্দী থাকতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসার প্রথম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই 'গোরা' উপন্যাসে (১৯১০)। এই গ্রন্থের মূলকথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার একেবারে শেষ অধ্যায়ে গোরার দু-একটি উক্তিতে—

"আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।··আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,··যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।"

—'গোরা'। অধ্যায় ৭৬

দেখা যাচ্ছে 'গোরা' রচনার কালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মবোধকে বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সর্বসম্প্রদায়ের উদার ও বিশ্বজনীন ভূমিকার উপরে স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।—

"রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি ধীরে ধীরে কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। তাঁহার কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্মও আজ তেমনি নিরর্থক।··গণ্ডিমাত্রই তাঁর কাছে অসত্য এবং এই গণ্ডি ভাঙাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের বাণী। গণ্ডি— যতই মোহন নামে মানুষের কাছে আসুক, দেশের নামে, ধর্মের নামে— কবির মনে তাহা সায় পায় না। তিনি সেই গণ্ডির মধ্যে বাস করিয়া এককালে তাহার জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন খাঁচা যতই সুন্দর হোক, আকাশ সুন্দরতর।··রবীন্দ্রনাথ গোরা, সুচরিতা ও পরেশবাবুকে যেখানে বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা মানুষের ধর্মের উদার ক্ষেত্র— সেখানে তাহারা হিন্দুও নহে, ব্রাহ্মও নহে, খ্রীস্টানও নহে— তাহারা মানুষ।" —'রবীন্দ্রজীবনী'। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১৮

'গোরা' প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই 'গীতাঞ্জলি'র বিখ্যাত 'ভারততীর্থ' কবিতাটি রচিত হয় (১৯১০ জুলাই ২)। এই রচনাটিতেও স্বভাবতই অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাতে ভারতবর্ষকে কোনো বিশেষ জাতি ও বিশেষ ধর্মের লীলাভূমিরূপে দেখা হয় নি, দেখা হয়েছে সর্বমানবের মিলনতীর্থরূপে। সে মিলন আজও পূর্ণ হয় নি, সর্বমানবের সমবেত স্পর্শে সে মিলনের পবিত্রতা আজও সার্থক হয়ে ওঠে নি। তাই তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন ওই বিশ্বজনীন উদারতার অভিমুখে।—

"এস হে আর্য, এস অনার্য,
হিন্দু-মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খ্রীস্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥"

এই সর্বসাম্প্রদায়িক উদারতার আদর্শই দেখা যায় তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতটিতেও (রচনাকাল ১৯১১ সালের শেষাংশ)। তাতে তিনি সেই ভারতবিধাতারই জয়গান করেছেন, যাঁর আহ্বান শুনে হিন্দু বৌদ্ধ

শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সব সম্প্রদায়েরই জনগণ এক উদার ঐক্যভূমিতে মিলিত হয়েছে। সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ঐক্যের এই যে আদর্শ, সে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোজীবনেরই প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। গীতাঞ্জলি (১৯১০) রচনার সময় থেকেই সে আদর্শের প্রতি তাঁর হৃদয়ের আকর্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে কথা একটু পরেই দৃষ্টান্তযোগে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করব। তার আগে উক্ত আদর্শের স্বরূপটিই একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি রচনার কয়েক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন (১৯১২ মে ২৪)। সঙ্গে নিয়ে যান ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি। বিলাতে যেসব মনস্বী ওই পাণ্ডুলিপি পড়ে খুশি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালেই 'বিলাতের চিঠি' নামে এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন (প্রবাসী, ১৩১৯ কার্তিক)। তার থেকে একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি।—

"তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খ্রীস্টান ধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক্, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মানুষের মন যখনই আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এদেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে [গীতাঞ্জলির] কোনো ধর্মের কোনো creedএর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি'।" —স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক। 'পথের সঞ্চয়'

গীতাঞ্জলির এই যে creed বা বীজমন্ত্রের লেশমাত্রহীন ধর্মের আদর্শ, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতা। আধুনিক কালে শিক্ষিত মনেরই এটা একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। বোধ করি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত মনের প্রবর্তনাই তাঁকে স্বভাবত এই পথে চালিত করেছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যে অচিরকালের মধ্যেই সচেতনতা লাভ করেছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। 'বিলাতের চিঠি' প্রবন্ধ প্রকাশের পরের বৎসরই (১৯১৩) দেখি 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি বীজমন্ত্রের গণ্ডিভাঙা অসাম্প্রদায়িক ধর্মের ব্যাখ্যা করছেন সাতই পৌষের (১৩২০) উৎসব উপলক্ষ্যে। এ প্রসঙ্গে আবার তাঁর মনে উদিত হয়েছে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের পূর্বোদ্‌ধৃত উক্তি। সেই উক্তিকে সূত্ররূপে গ্রহণ করে তিনি যা বলেছেন তা বিশেষরূপে স্মরণীয়।—

"স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা [গীতাঞ্জলির] জড়িত নয় বলে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। তার কারণ, খ্রীস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয়, তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না।· ·

"স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্বদেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন; বললেন, 'তোমরা খুব বেঁচে গেছ'। ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, সে বড়ো বিপদ্‌। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশ-কালের ছাপ নেই— তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিম দেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

"পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য খ্রীস্টান অত্যন্ত খ্রীস্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সব রকম সাহিত্যরস সবাই নিজের বলে উপভোগ করবে এইটি হয়ে উঠেছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, সেইসব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিম দেশের যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকও একজন। খ্রীস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি।"

—অগ্রসর হওয়ার আহ্বান। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথও নিজের সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পেয়েছেন এবং সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ সার্বভৌমিক মূর্তিতে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম যেখানে সংকীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাকে মানেন নি। তিনি অনুভব করেছিলেন, "ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে"। রামমোহন রায়ের সময়ে বাংলা দেশে যে ধর্মচিন্তা ও ধর্মসংস্কারের সূত্রপাত হয় তার পূর্ণ পরিণতি ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এইখানে। আমার মনে হয় বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষেরই ধর্মচিন্তার ইতিহাসে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

২

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-আদর্শের দুই দিক। এক দিকে সর্বপ্রকার সংস্কার-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্ররোষ, সেখানে বিনাশের শক্তিমন্ত্রই তাঁর বাণী। আর-এক দিকে উদার বিশ্বজনীনতার দিকে তাঁর প্রসন্ন চিত্তের আকর্ষণ, এখানে সৃষ্টির আনন্দবাণীই তাঁর আশ্রয়।

দেশ- কাল- ও সম্প্রদায় -গত সংস্কার ও সংকীর্ণতাকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন ও তার বিলয় কিভাবে কামনা করতেন তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করি।—

"আমাদের ধর্মকে যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলি তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে।· ·

"একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি— অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।· ·

"যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের সেই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মত মানুষকে চাপিয়া ধরে, মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া দিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়।"

—ধর্মের নবযুগ (১৯১২)। 'সঞ্চয়'

এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয় (ভারতী, ১৩১৮ ফাল্গুন), তখনও রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করেন নি, স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গেও দেখা হয় নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধর্মের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা তখনই কেমন কঠোর হয়ে উঠেছিল। এই যে সংস্কারগত সংকীর্ণতা, তার প্রতিকারের বাণীও তিনি উচ্চারণ করেছেন নির্মমচিত্তেই।

"মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে তুলেছে।· ·ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

"এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন ঝড় হয়। তবে মুক্তি।"

—অমৃতের পুত্র (১৯১৫)। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড

এই যে সংস্কারের প্রাচীরের উপরে ঈশ্বরের বজ্রাঘাতের কথা, ধর্মগত মোহের সংকীর্ণতার উপরে ভগবানের অভিসম্পাতের কথা, তা রবীন্দ্রনাথের বাণীতে বারবারই দেখা দিয়েছে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই। সম্প্রদায়গত ধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি বলেছেন ধর্মমোহ। এই ধর্মমোহ মানুষের যত ক্ষতি

করেছে এবং করছে এমন আর-কিছুই নয়। যত সত্বর এই মোহের বিনাশ ঘটে ততই কল্যাণ। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই।—

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে;
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে।
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি'
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

—ধর্মমোহ (১৯২৬)। 'পরিশেষ'

যে পানীয় মানুষের জীবনকে রক্ষা করে সে যখন বিষাক্ত হয় তখন তার চেয়ে ভয়ানক আর কিছু নেই। যে ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, সমাজকে রক্ষা করে, সে যখন সংকীর্ণ হয় বিকৃত হয় তখন তার মতো কারাগার তার মতো বন্ধন আর হয় না। এইজন্যই সংকীর্ণ ধর্ম, বিকৃত ধর্ম তথা মোহগ্রস্ত ধর্মাদর্শের উপরে রবীন্দ্রনাথ এমন খড়্গহস্ত। তার চেয়ে নাস্তিকতাও ভালো। কেননা, নাস্তিকতায় বুদ্ধিবৃত্তিকে উজ্জ্বলই করে, আচ্ছন্ন করে না, মানুষের কল্যাণবোধকেই জাগ্রত করে, বিরোধকে উদ্যত করে না। সংকীর্ণ ধর্মের চেয়ে যে নাস্তিকতাও ভালো, তা তিনি একবার রোমাঁ রোলাঁকেও বলেছিলেন কথাপ্রসঙ্গে।—

"So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept facts of life.· · It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil; it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible.

As a matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack of *a wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion.* Even a vogue of atheism may do good to India today. It will sweep away all obnoxious undergrowths in the forest and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West will be of value to a large section of the Indian people."

—*Rolland and Tagore* (1945), পৃ ১০০-১০১

নিষ্প্রাণ নিষ্ক্রিয় অপধর্মের প্রতি সজীব সৃষ্টিশীল ধর্মের যে কল্যাণকর অসহিষ্ণুতার কথাগুলি আমরা বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলাম, তার স্পষ্ট পরিচয়ই পেয়েছি পূর্বোদ্ধৃত কয়েকটি অভিমতের মধ্যে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অপধর্ম বা ধর্মগত সংকীর্ণতার প্রতি একটা তীব্র অসহিষ্ণুতা পাবকশিখার মতোই নিত্য দীপ্যমান ছিল, তার উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ কোনোটাই কম ছিল না। সেই উত্তপ্ত অসহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে। শ্যামলী গৃহে কথায় কথায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রসঙ্গ উঠল। সে আলোচনার পূর্ণপরিচয় দেওয়া এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। উভয় সম্প্রদায়েরই গোঁড়ামি ও অন্ধতার কথা বলতে বলতে তাঁর মুখে চোখে যে উত্তেজনার আভা ফুটে উঠল তা আজও ভুলতে পারি নি। উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন, আমার ইচ্ছা হয় দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত নাস্তিকতার একটা প্রচণ্ড বন্যা বয়ে যাক, ধর্মের যত কুসংস্কার যত আবর্জনা সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক, বন্যার শেষে পলিমাটির উর্বরতায় দেশ আবার ফলে-শস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তা না হলে দেশে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠার আর কোনো উপায় নেই, ইত্যাদি। তখনও *Rolland and Tagore* গ্রন্থ তথা রোলাঁ-ঠাকুর-সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। পরে দেখলাম, আমাকে যা বলেছিলেন তাতে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। যা হোক, এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যাবে ধর্মসংকীর্ণতার প্রতি তাঁর মনোভাব কত কঠোর ছিল এবং কতখানি আন্তরিকতা নিয়ে তিনি তাঁর ঐকান্তিক বিলয় কামনা করতেন। এই বিলয়ের কামনা থেকেই তিনি বারবার বিধাতার নির্দয়তা, তাঁর রুদ্ররোষ, তাঁর বজ্রাঘাতকেও প্রার্থনা করেছেন। ওই আঘাত ও বিনাশের পরেই আসবে নবতর মহত্তর সৃষ্টির সুযোগ।

৩

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।" —'নৈবেদ্য', ৭২

এই বাণীর মধ্যে এক দিকে আছে ভাঙার কথা, অপর দিকে আছে গড়ার কথা। ভাঙার দিকটা, যার মূলে আছে তাঁর মহৎ অসহিষ্ণুতার প্রেরণা, সে দিকটার কথা বিশদভাবেই আলোচনা করা হয়েছে।

এবার গড়ার দিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন; উদ্ধৃত অংশটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শ ধর্ম তাই যা বিচারহীন আচারের ঊষরতার দিকে জীবনকে চালনা করে না, পৌরুষকে খণ্ডিত করে না, যা নিত্যই কর্ম চিন্তা ও আনন্দের দিকে প্রেরণা দান করে। পূর্বে দেখেছি সে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদ স্বীকার করে না, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে যে প্রাচীরের ব্যবধান তাকে সে নিঃশেষে ভেঙে ফেলতে উদ্যত। কাজেই এই যে নবধর্ম-বোধ, চিরাগত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। এখানেও আছে মহৎ অসহিষ্ণুতার প্রেরণা।—

"আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন-একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।" —ধর্মের নবযুগ (১৯১২)। 'সঞ্চয়'

এখানেই রবীন্দ্রনাথের নবধর্মের স্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। সে ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট কাল বা সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নয়, তা সর্বকালের এবং সর্বমানবের সম্পদ্; তা কোনো শাস্ত্রনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত নয়; মানুষের স্বাধীন বিচার ও মুক্ত জ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ থাকবে না, জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলার শক্তি তার থাকবে; চিন্তা কর্ম ও হৃদয়বোধ জীবনের সর্ববিভাগের মধ্যেই সে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। এই সামঞ্জস্যরক্ষাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের প্রধান কথা। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য। ধর্ম হবে জ্ঞান- ও সত্য- নিষ্ঠ; যথার্থ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে ধর্মজীবনকে সত্যপথের নির্দেশ দিতে পারে না। কিন্তু নিছক জ্ঞানের মধ্যে প্রেমের বা কর্মের প্রেরণা থাকে না। প্রেমই জীবনকে কল্যাণের পথে প্রেরণা দান করে। কিন্তু জ্ঞান- ও কর্ম- হীন প্রেম নিষ্ফল ভাববিলাসিতায় পর্যবসিত হয়। আর প্রেমহীন কর্ম মানুষকে চালনা করে হিংস্রতার পথে এবং জ্ঞানহীন কর্ম তাকে নামায় পশুত্বের স্তরে। আমাদের চিরাগত ধর্মসমূহ এই সামঞ্জস্যের অভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে নানা সংস্কারের বিকার তো ঘটেছেই, তা ছাড়া যথানুপাতিক সামঞ্জস্যের অভাবেও প্রেরণাশক্তি হারিয়েছে। উপনিষদের ধর্মে জ্ঞান ও সত্যের উজ্জ্বলতা আজও জগতের বিস্ময়স্থল; অবশ্য তাকেও আধুনিক জ্ঞানের উপযোগী করে নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাতে প্রেমের প্রেরণা ও কর্মের নির্দেশ খুবই দুর্বল। তাই তা নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানের স্থান উচ্চে, তাতে মৈত্রী-করুণার প্রেরণাও দুর্বল নয়। তারই ফলে বৌদ্ধধর্ম একদা বিশ্ববিজয়ে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তার জ্ঞানের দিক অবাস্তবতার পথে অগ্রসর হয়ে ওই ধর্মকেই নিষ্ফলতার মধ্যে ঠেলে দিল। বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমের স্থান উচ্চে, জ্ঞানের প্রেরণা দুর্বল। তাই ভাববিলাস ও রসবিকারের মধ্যেই তার অবসান। খ্রীস্টান ধর্মে মৈত্রী করুণা প্রভৃতি হৃদয়বোধের উৎকর্ষ ঘটেছিল খুবই; তাতে এককালে বহু মানুষকেই এক করেছিল। কিন্তু তাতে জ্ঞানের প্রভাব বড়ই ক্ষীণ। তাই আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে স্বীকৃতি পায় না; ফলে খ্রীস্টান ধর্মের মহত্ত্বের দিকটাও আজ অবজ্ঞাত। তাই খ্রীস্টান

সম্প্রদায়ের লোকেরাই আজ বিশ্বজগৎকে টানছে বিনাশের দিকে। প্রাচীন ধর্মগুলির এই অপূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বিশেষ ভাবেই পীড়া দিয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তাঁর উক্তি উদ্‌ধৃত করে এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার স্থান নেই এ প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী করুণা, এবং বৈষ্ণব ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রেমভক্তি একত্র সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ, আচারপদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের উপাসিত ধর্মও এসবের পরম বিরোধী। কেননা এগুলির দ্বারাই মানুষে মানুষে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ সৃষ্টি হয়। শুধু আচার-অনুষ্ঠান নয়, ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক নামগুলিও ওই ভেদসৃষ্টির পরম সহায়ক। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, গড আল্লা বিষ্ণু শিব এবং ব্রহ্মা কখনো এক নন; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ সৃষ্টির মূলে রয়েছে সম্প্রদায়ের ট্রেড-মার্ক-দেওয়া এই নামগুলি। বিভিন্ন ধর্মের ক্রীড, কলমা বা বীজ-মন্ত্রগুলির প্রভাবও কম নয় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদসৃষ্টির পক্ষে। এ প্রসঙ্গে উপাসনা-গৃহের অর্থাৎ গির্জা মসজিদ এবং মন্দিরের পার্থক্যও উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রস্বীকৃত ধর্মে এসবেরও কোনো স্থান নেই। ক্রীড বা বীজমন্ত্র হীনতার কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। ঈশ্বরের বিশেষ নামহীনতাও উক্ত ধর্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। আর, বিশেষ ধরনের উপাসনাগৃহ যে এ ধর্মের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় এ কথাও সকলেরই জানা। ফলে সব সম্প্রদায়ের লোকই এই ধর্মের আশ্রয়ে অনায়াসেই এক হয়ে মিলতে পারে। যেমন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে"

"অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে"

"আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ
সংসার-কাজে"

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে যেন করতে পারি জয়"

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো"

ইত্যাদি প্রার্থনা-সংগীতগুলি কোন্ সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে অগেয় বা অশ্রাব্য? তাতে কোনো সম্প্রদায়ের চিহ্নমারা দেবতার নামও নেই। কোথাও শুধু তুমি, কোথাও অন্তরতর, অন্তর্যামী, নাথ, প্রভু, জীবনস্বামী ইত্যাদি অসাম্প্রদায়িক বা সর্বসাম্প্রদায়িক সম্বোধন মাত্র আছে। এই প্রার্থনার জন্য কোনো বিশেষ উপাসনাগৃহও নিষ্প্রয়োজন; ধর্মের এই উদারক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়ের লোকই অনায়াসে মিলতে পারে। সর্বপ্রকার

বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট ক্রীড, নাম বা উপাসনাগৃহের ব্যবধান এক্ষেত্রে একেবারেই নেই। সর্বধর্মের এমন উদার মিলনক্ষেত্র আর কোথায় আছে জানি না। অথচ এ ধর্ম আধুনিক কালের জ্ঞান এবং শিক্ষারও বিরোধী নয়; ভাব ও রসের অথবা প্রেমভক্তির অপ্রতুলও নেই; আর কল্যাণকর্মের প্রেরণা তো রয়েছে প্রচুর পরিমাণেই। কোনো মন্ত্রতন্ত্র বা আচার-অনুষ্ঠানও এর পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক। সংস্কারহীন দৃষ্টিতে দেখলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বৈদিক ঋক্‌মন্ত্র বা সাম-সংগীত কিংবা খ্রীস্টানি psalm বা hymn কোনো কিছুই ভাবের গভীরতা, রসের উৎকর্ষ বা প্রেরণার মহত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়। বস্তুত মন্ত্রের গাম্ভীর্য বা পবিত্রতার বিচারেও এই গানগুলি অতুলনীয়। সর্বপ্রকার মন্ত্রাদি বর্জন করে একমাত্র এই গানগুলির সাহায্যেই সব রকম মঙ্গলকার্যই অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাতে ওসব কার্যের পবিত্রতা বেড়ে যাবে বলেই মনে করি। এই গানগুলির আশ্রয় নিলে সর্ববিধ ধর্মকার্যেই সাম্প্রদায়িক মন্ত্রতন্ত্র ও বিশেষ অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে নির্বিশেষ মানুষের উদার মিলনক্ষেত্র রচিত হতে পারে।

৪

এ অভিমত যে একা আমারই তা নয়। আধুনিক যুগের উদার শিক্ষা ও উন্নত মনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকারী বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অভিমত উদ্ধৃত করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম উৎকর্ষ পাওয়া যায় কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তরে বিনয়কুমার সরকার বলছেন (১৯৪২ সালে)—

"··সে হচ্ছে ভগবান্ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কল্পনা। মানুষের সঙ্গে ভগবানের যোগাযোগ রবীন্দ্রসাহিত্যে যারপরনাই ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে কল্পিত হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, যে-কোনো ধর্মের লোক, যে-কোনো দলের লোক এইরূপ ভগবান্ পেয়ে নিজেকে শক্তিমান্ সম্‌ঝিতে সমর্থ। রাবীন্দ্রিক ভগবৎ-সাহিত্যের মুদ্দাটা দেখবি? 'প্রতিদিন আমি, হে জীবন-স্বামি, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে'—এই গানটা শুনেছিস বোধ হয়। রাবীন্দ্রিক ভগবান্ আগাগোড়া এই সুরে গড়া।

"··সকল প্রকার ভারতীয় ভগবানের কল্পনা রবীন্দ্রচিত্তে ঠাঁই পেয়েছে। তবুও বলছি, উপনিষদের মন্তরগুলায় যে ভগবান্ পাওয়া যায় সেই ভগবানের সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন রৈবিক ভগবান্। কিন্তু সেই ভগবানের চেয়ে এই রৈবিক ভগবান্ সরস, আত্মীয় ও মানুষময় বেশী। অপর দিকে বৈষ্ণব ভক্তি-সাহিত্যের ভগবান্ রাবীন্দ্রিক ভগবানের মতনই বস্তুপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বময়। কিন্তু বৈষ্ণব ভগবান্ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভগবানের সমান সর্বজনীন ও সনাতন নন।

"দুনিয়ার নানা দেশের সংস্কারগুলা, রীতিনীতিগুলা আর লোকাচারগুলা ভুলে যা। দেখবি, রবীন্দ্রসৃষ্ট ভগবানের মতন মানুষমাত্রের কার্যোপযোগী, মানুষমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান্ আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।"

—'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। প্রথম ভাগ, পৃ ৫৮

এই শেষের কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুনিয়ার নানা দেশের ও সম্প্রদায়ের সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপদ্ধতি তথা তাদের ভগবৎ-নাম, ধর্মের ক্রীড, ডগমা প্রভৃতি বাদ দিয়ে যে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় তিনি তো সর্বসাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক বা অতি-সাম্প্রদায়িক; তিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন;

তাঁর উপাসনায় সব ধর্মের লোকই অসংকোচে একত্র মিলিত হতে পারে বিশ্বজনীনতার উদার ক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের আর-এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে সংঘ ও সংহতির সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সধর্মীর সঙ্গে মিলনের প্রয়োজনে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে হয়। রবীন্দ্রস্বীকৃত ভগবানের উপাসনায় ধর্মের ক্ষেত্রে সবাই একত্র মিলতে পারে, অথচ সকলেরই ব্যক্তিত্ব শুধু অক্ষুণ্ণ থাকে না, বরং উজ্জ্বলতর হয়েই ওঠে। যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিবৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে যে বিশ্বজনীনতা নিহিত থাকে তারই চিরন্তন ভিত্তির উপরেই রবীন্দ্রধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাই এখানেই রচিত হয়েছে বিশ্বধর্মের মিলনভূমি। রবীন্দ্রনাথের মতো এই বিশ্বজনীন মিলনের প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা। ওই প্রেরণাই চিরকাল ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, তাকে নিত্যবিবর্তনের দিকে চালনা করেছে। তিনি মনে করেন, হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীস্টান প্রভৃতি সব ধর্মের আন্তরিক মিলনের মধ্যেই সে প্রেরণার চরম সার্থকতা। রবীন্দ্রধর্ম সে উদ্দেশ্যসাধনের সেই চরম সার্থকতারই আদর্শস্থল। এ বিষয়েও বিনয়কুমার সরকারের অভিমত (১৯৪২) শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণীয়।—

"উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন—বিশেষভাবে আত্মিক সমঝোতা—অনিবার্য।· ·যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে।· ·হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমিলন অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের ভেতরও যেমন অবশ্যম্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন অবশ্যম্ভাবী।· ·আমার বিশ্বাস, আমাদের এখনকার আবহাওয়াতেই হিন্দু-মুসলমানের সমবেত বা যৌথ ধর্মের কাঠাম কাজ করছে। সমসাময়িক বঙ্গসংস্কৃতি আর বঙ্গসমাজ এই যৌথধর্ম মেনেই চলছে।· ·আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্ম-গীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়। এসব হচ্ছে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বর-বিষয়ক স্তোত্র। এসবকে আমি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভগবদ্‌গীতা সমঝে থাকি। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্মোপদেশসমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এইসবের ভেতর আমি পাই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮০ সনের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগবান্‌রূপে পূজা করবে।" —'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। প্রথম ভাগ, পৃ ৪৪৩-৪৫

৫

রবীন্দ্রনাথ সর্বসম্প্রদায়ের 'যৌথ ভগবদ্‌গীতা' রচনা করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর মধ্যে ছিল সর্বসম্প্রদায়ের 'যৌথধর্মের' প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের মতে এই প্রেরণা ভারতবর্ষেরই চিরন্তন প্রেরণা। এই প্রেরণার ক্রিয়া দেখি প্রাচীন কালের ভগভদ্‌গীতায় এবং মধ্যযুগের কবীর নানক প্রভৃতি সাধকদের ভজনগুলিতে। গীতায় আছে ভারতীয় শাখা-ধর্মগুলির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা, আর ওই ভজনগুলিতে দেখা যায় ভারতীয় এবং অভারতীয়, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় প্রয়াসটি কঠিনতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস এবং সে প্রয়াস মধ্যযুগে পুরোপুরিভাবে সফল হয় নি; যদিও তৎকালীন সাধকদের প্রয়াসের মধ্যে রয়েছে সার্থকতা লাভের পথনির্দেশ। তাই আজও আমরা সেই পরীক্ষারই সম্মুখীন রয়েছি। বর্তমান কালে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই সাধনার পথে

আমাদের চালনা করেছেন রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের এই ধর্মসাধনার কথা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। মধ্যযুগের সেই মিলনসাধনা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ এই।—

"ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্য সাধনাকেই নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

"মুসলমান-ধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

"এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাই নে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু, সেই মুসলমান-অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমান-ধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

"সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ্ সম্বন্ধে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

"ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান-ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন-একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এই-জন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।"

—ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা (১৯১১)। 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড

নানক কবীর দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকদের সমন্বয়-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কত গভীর তা সুবিদিত। তিনি তাঁদের রচনা নিয়ে নানা স্থানে নানা উপলক্ষ্যে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করব।—

"দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যূষের অতন্দ্রিত পাখি, পেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। সেই

মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ।· ·তিনি বলেছেন,

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব,· ·এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ুঁ গুরু সুঁ হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু-মুসলমান মিলে যায়।

"এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।· · ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তাহলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে মুসলমান, ঐ তো এসেছে খ্রীস্টান—·

সাধন মাহিঁ জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।

ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তাহলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে।"

—ভারতপথিক রামমোহন (১৯৩২)। 'চারিত্রপূজা'

কবীর-দাদূ-রজ্জব-রামমোহনের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভারতপথেরই পথিক। ওই পথের তিনিই শেষ পথিক এবং শ্রেষ্ঠ পথিক। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সকলকে এক অসাম্প্রদায়িক বা অতিসাম্প্রদায়িক ধর্মভূমিতে মিলিত করাই ছিল তাঁর ভারতপথ-সাধনার চরম লক্ষ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামমোহনের আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, "রামমোহন রায় ভারতপথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক— যেখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে, "আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন" সেই রামমোহনের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েই তিনি 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে' ইত্যাদি বিখ্যাত 'ভারতপথের গান'টি রচনা করেছিলেন।

এ কথা সুবিদিত যে, রামমোহনের মধ্যে যে বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার উদ্‌বোধন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তারই পরিণতি ও পরিসমাপ্তি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রামমোহনের জীবন-সাধনার তাৎপর্য অনুধাবন করলে তাঁরই জীবন সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চরম উক্তি এই।—

"তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"

—ভারতপথিক রামমোহন (১৯৩২)। 'চারিত্রপূজা'

এই উক্তি রামমোহন সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য, তার চেয়ে অধিকতর প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন সম্বন্ধে। তিনি সংস্কৃতি- ও ধর্ম- সাধনার যে প্রশস্ত পথ রচনা করেছেন, অনতিদূর ভবিষ্যতে সে পথে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-নির্বিশেষে সব মানুষই অবিরোধে চলতে শুরু করবে, এই মর্মে বিনয়কুমার সরকারের উক্তি পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে।

৬

অতঃপর ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মসমন্বয়-সাধনার নীতি সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা দরকার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ-নিরসনের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অশোক, আকবর, রামানন্দ থেকে রামমোহন পর্যন্ত ধর্মসাধকগণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের প্রয়াস এক ধরনের নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এঁদের প্রয়াস প্রধানত দুই পর্যায়ভুক্ত। এক পর্যায়ে আছে ধর্মনীতি, শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের বাহ্য সংঘটনের প্রয়াস; ইংরেজিতে যাকে বলে eclecticism, এ প্রয়াস মূলত তাই। এ প্রসঙ্গে আকবর (দীন-ইলাহি), রামকৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ করে মনে পড়ে। এ মতের প্রধান কথা— 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা ৪।১১), 'যত মত তত পথ' (রামকৃষ্ণ)—যে যেভাবেই সাধনা করুক তাতেই তার মুক্তি। এ হচ্ছে স্বীকৃতির দ্বারা সহিষ্ণুতার দ্বারা সকলের একত্র সমাবেশ ঘটাবার চেষ্টা। এ মতের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম· ·
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম;
সবকো সন্মতি দে ভগবান্।

ভগবদ্দত্ত 'সন্মতি' অর্থাৎ সর্বমত-সহিষ্ণুতার উপরেই এর ভরসা। এ মিলন বাহ্যমিলন; পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুকেও নির্বিরোধে একত্র সমাবিষ্ট করাই এর আদর্শ। নানা ধর্মের নানা শাস্ত্র (গীতা-কোরান-বাইবেল), ও আচার, ভগবানের বিভিন্ন নাম (গড-আল্লা) প্রভৃতি সবকিছুকে মেনে নেওয়ার উপরই এর আশ্রয়। এর মূলে কোনো নিত্যসত্যের দৃঢ় ভূমি নেই। সুতরাং এ মিলনের স্থায়িত্বও সুনিশ্চিত নয়।

✓ দ্বিতীয় পথের লক্ষ্য বাহ্য সমাবেশ বা অবিরোধমাত্র নয়, অন্তরের মিলন। এই পথের যাত্রীদের মধ্যে অগ্রণী হলেন অশোক। অতঃপর দীর্ঘ ব্যবধানের পরে মধ্যযুগে কবীর নানক দাদূ প্রভৃতি এ পথে পদচারণা করেন। আধুনিক যুগের আরম্ভে রামমোহন এবং অন্তে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবকেই এই পথের আহ্বান জানান। এই পথের বৈশিষ্ট্য এক দিকে বিশ্ববোধ এবং অপর দিকে চিরন্তনতা-বোধ। যা কিছু খণ্ডকালীন ও খণ্ডদেশিক তাকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। নিত্যসত্যের অন্তরায়মাত্রের প্রতি তাঁদের অসহিষ্ণুতা চিরজাগ্রত। 'নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি'র প্রতি তাঁরা সদা খড়্গহস্ত। খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবের প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণে তাঁরা অক্লান্ত। বিশ্বমানবের অন্তরে যে অখণ্ড নিত্যসত্যের বোধ নিহিত আছে, একমাত্র তাকেই তাঁরা সত্যধর্মের আশ্রয় বলে স্বীকার করেন। যেসমস্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি এই নিত্যসত্যকে খণ্ডিত বা আচ্ছন্ন করে, তাঁরা সেগুলির অপসারণেই বদ্ধপরিকর।

বলেছি ধর্মসমন্বয়ের এই আদর্শের মূলে আছে বিশ্ববোধ। এই বিশ্ববোধ সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে অতীত কালে অশোকের মধ্যে এবং আধুনিক কালে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এই ঐতিহাসিক সত্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ধর্মের আচারাদি বাহ্যলক্ষণের প্রতি এঁদের বিরূপতা কতখানি তাও জানা কথা। অশোকের নবম গিরিলিপি থেকে জানা যায়, তিনি স্ত্রী-আচার লোকাচার প্রভৃতি অসংখ্য নিরর্থক অনুষ্ঠানের প্রতি কতখানি বিরূপ ছিলেন। পুত্র-কন্যার বিবাহ, শিশুর জন্ম, রোগাক্রমণ, প্রবাসযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে বহুবিধ নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠান ('মঙ্গলম্') তৎকালে প্রচলিত ছিল, অশোকের কণ্ঠে তার প্রতিবাদ কঠোর ভাবেই উচ্চারিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে মূর্তিপূজা সতীদাহ প্রভৃতি বাহ্য ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রতিবাদের কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। মধ্যযুগের সাধকদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে।

মন্দিরে মসজিদেই ভগবানের সত্য পথ আচ্ছন্ন হয়েছে। তাঁরা সেকালেও সাহস করে বলতে পেরেছিলেন— ভগবান্ মন্দিরেও নেই, মসজিদেও নেই, কাবাতেও নেই, কৈলাসেও নেই ; ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনাতেও তাঁকে পাওয়া যায় না ; কোরান-পুরাণও কথার সমষ্টি মাত্র ; ভগবান্ আছেন প্রত্যেকেরই অন্তরের অন্তস্তলে।

এই বাহ্যবিমুখতা ও অন্তর্মুখীনতা এই ভারতপথিকদের চালনা করেছে সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত সারসত্যের প্রতি। দ্বাদশ গিরিলিপিতে অশোক তাঁর ধর্মনীতি অতি স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, সব সম্প্রদায়কেই তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এই শ্রদ্ধাপ্রদর্শনকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন না ; তাঁর মতে সর্বধর্মের 'সারবৃদ্ধি'সাধনের ন্যায় আর কিছুই নয়। সর্বধর্মের অন্তরে যে নিত্যবস্তু বা শাশ্বত সত্য ('পোরানা পজিতি') রয়েছে তাকেই তিনি বলেছেন ধর্মের সার, এবং সারধর্মের পোষণ ও প্রসারকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সত্যনিষ্ঠা, অন্তরের শুচিতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি সর্বধর্মস্বীকৃত চিরকালের ধর্মকেই তিনি 'সার' বলে অভিহিত করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অশোক-স্বীকৃত ধর্মে ঈশ্বরের কোনো উল্লেখই নেই। মানুষ এবং সর্বজীবের কল্যাণ-সাধনই সে ধর্মের লক্ষ্য। মধ্যযুগের রামানন্দ থেকে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতপথিকদের ধর্মে ভগবানের স্থান উপেক্ষণীয় নয় ; কিন্তু এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, অন্তরের শুচিতা এবং সব মানুষের ঐক্যবোধ ও কল্যাণচেষ্টাই ওই ধর্মের মূল কথা, এই ঐক্যবোধ ও কল্যাণব্রতের অবলম্বন হিসাবেই ভগবানের সাধনা। আরও লক্ষণীয় এই যে, রামানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যতই আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে আসা যায় ততই দেখা যায় তাঁদের ধর্মে মানুষের গৌরব ক্রমেই বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথে এসে দেখি সে ধর্ম 'মানুষের ধর্ম' নামেই অভিহিত হয়েছে ; মানুষের মধ্যে ভগবানের যে প্রকাশ তার সাধনাতেই এ ধর্মের সার্থকতা। মানুষের জীবন- ও কল্যাণ- নিরপেক্ষ ভগবানের আরাধনা এ ধর্মে অস্বীকৃত। একটু বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে—বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, সংস্কৃত স্তোত্র-গান প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান এ ধর্মের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অনেক সময় তার অন্তরায়ও বটে। এই যে ক্রীড-হীন, শাস্ত্রহীন, আচার-অনুষ্ঠান-হীন, ভগবানের নামরূপ হীন, ব্রাত্যধর্ম যার পরিচয় 'মানুষের ধর্ম' ব'লে, যার লীলা

ও প্রকাশ সর্ব মানবের জীবনে, এই ধর্মই হবে আমাদের ভাবীকালের সার্বভৌমিক ধর্ম। সে ধর্মের মর্ম ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে।—

১

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না-যে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥

২

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে।
অন্ধকারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস,
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে।
মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

ওড়িয়া কবি রাধানাথ ও মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি রাধানাথ রায় তাঁহার কাব্যরচনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচিত মহাযাত্রা বিশেষ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ওড়িয়া সাহিত্যসেবীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। মহাযাত্রা ভারতের মহাপ্রস্থানপ্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া ভারতের দুর্গতি ও উড়িষ্যার বিশেষ বিশেষ স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনায় সার্থক হইয়াছে, রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেদারগৌরী, চন্দ্রভাগা, নন্দিকেশ্বরী, উষা ও পার্বতী, এবং কাব্য পঞ্চক ইতিহাস বা স্থানীয় কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়া রোমান্টিক ভাব নানাপ্রকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়র শেলী বায়রন, এইসব ইংরেজ কবির প্রভাব তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার চিলিকা কাব্যে সৌন্দর্যপ্রেমী পাঠক চিল্কা হ্রদের কাব্যময়ী প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তাঁহার দরবার নামক কাব্য ব্যঙ্গ-রচনায় তাঁহার চাতুর্য প্রমাণ করিয়াছে।

রাধানাথ দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করিয়াছেন। তিনি শুধু পাশ্চাত্য ভাবধারাই গ্রহণ করেন নাই, প্রাচ্য ভাবধারাও তাঁহার কাব্যরচনার মূল্যবান উপাদান। মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কর্মজীবনে ও সাহিত্যজীবনে তিনি যে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান প্রবন্ধে কিছু বিবৃত করিতেছি। এই পুরাতন কাহিনী তখনকার দিনে ভূদেববাবুর পরলোকগমনের পর রাধানাথ সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রীযুত দুর্গাচরণ রায় প্রণীত রাধানাথ-জীবনীতে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ভূদেববাবুর উড়িষ্যায় শুভাগমন রাধানাথ তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে ভূদেববাবু স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর হইয়া উড়িষ্যার স্কুল-পরিদর্শনের জন্য কটকে আসেন। তখন তাঁহার সর্বত্র প্রতিপত্তি। স্যার এস্‌লি ইডেন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে লিখিয়াছিলেন— ইউরোপীয়দের উচ্চতর গুণাবলীর অনেকগুলি ভূদেবের আছে। তাঁহার দেশবাসীর স্বাভাবিক ত্রুটি খুব অল্পই তাঁহার স্বভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যদি আমাদের সিভিলিয়ানদের মধ্যে অর্ধেকও তাঁহার মত বিচারশীল কর্মী হইত! ভূদেববাবুর সহিত রাধানাথের এই প্রথম দেখা। ভূদেববাবু কটকে আসিয়া রাধানাথকে লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। যাওয়ার পথে বালিয়ন্তা চটিতে থাকিবার সময় কথাবার্তায় ভূদেববাবু বিরক্ত হইয়া গ্যয়টের কোনো গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষকতায় একটি বাক্য উদ্ধৃত করেন। রাধানাথ সেই বইখানি পড়িয়াছিলেন। তিনি ভূদেববাবুর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, আপনি যে-কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু এ-স্থলে তাহার প্রয়োগ ঠিক হইল না। ভূদেববাবু আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন।— তুমি কি বুঝিয়া আমার কথা সত্য বলিলে? তুমি কি গ্যয়টের নাম শুনিয়াছ? তাঁহার কোনো বইয়ের খবর রাখ কি?

— আজ্ঞে, আমি অবশ্য মূল বই পড়ি নাই, অনুবাদই পড়িয়াছি।

— অনুবাদের কথাই বলিতেছি। আমিই কি মূল বই পড়িয়াছি!

— আজ্ঞে, আমি সেই অনুবাদই পড়িয়াছি।

— তুমি এই বই পড়িয়াছ! গ্যয়টের আর কোনো বইয়ের নাম বলিতে পার?

রাধানাথের নিকট হইতে তাঁহার পড়িবার অভ্যাস জানিতে পারিয়া, ভূদেববাবু কোন্ কোন্ ভাষা তাঁহার জানা আছে এই প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার পরে তাঁহার নিকট হইতে জীবনের স্থুলবৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি প্রীত হইলেন। বালিয়ন্তা হইতে তাঁহারা ভুবনেশ্বরে গেলেন। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন কীর্তি দেখিয়া ভূদেববাবু মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর যখন সেই স্থান হইতে সরদেইপুর চটিতে বিশ্রাম করেন তখন সেই প্রাচীন আর্যকীর্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকিল। রাধানাথকে তিনি সুর করিয়া সংস্কৃত শ্লোক পড়িতে বলিলেন, রাধানাথ আবৃত্তি করিলেন—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥

তাঁহার মুখে মেঘদূতের শ্লোক শুনিয়া ভূদেবের বিশাল নেত্রদ্বয়ে অশ্রু বহিল, কোন্ এক অনির্বচনীয় ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আহা কি সাহিত্য, কি কীর্তি! আজ আমরা কি হইয়া গিয়াছি!

কথায় কথায় ওড়িয়া সাহিত্যের অগ্রণীদের নাম উঠিল। ভঞ্জ কবির জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে তিনি রাধানাথকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। সরদেইপুর হইতে তাঁহারা পুরী গেলেন। পুরীতে কিছুকাল থাকিয়া আবার কটকে ফিরিলেন। রাধানাথ এই সময়ে যে কয়দিন তাঁহার সংসর্গে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন সেই কয়দিন তিনি তাঁহার জীবনের উৎসবময় কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটু অবকাশ পাইলেই উভয়ে ইংরেজি সংস্কৃত ও ওড়িয়া সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। ইহার পর ভূদেববাবু উড়িষ্যায় আসিয়া দশ-পনের দিনের বেশি কখনও থাকিতেন না, কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে রাধানাথ তাঁহার নিকটে যতদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ততখানি শিক্ষালাভ এক বৎসরেও তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট ছিল। একবার তাঁহার নিকটে রাধানাথ কিরূপ ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছিলেন সে কথা রাথানাথ বলিয়াছেন। আলোচনার বিষয় ছিল সংস্কৃত সাহিত্য। কালিদাসের উপমা— উপমা কালিদাসস্য— সর্বকালে সাধুবাদ অর্জন করিয়া আসিয়াছে: সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং নিনায় তাং।
নির্বাতস্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ॥

ভূদেব মন্তব্য করিলেন— উপমাটি বড় সুন্দর, কিন্তু এই শ্লোকে কবির কোনো দোষ কি দেখিতে পাও না?

রাধানাথ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

ভূদেববাবু বলিলেন— তোমাকে এত স্থূলবুদ্ধি বলিয়া ভাবি নাই। তুমি শুধু অলংকার-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া চরিত্রসংগতি বিষয়ে একেবারে অন্ধ হইয়া আছ। দেখ নাই, কবি কোন্ জায়গায় সীতার মুখে হাসি দিয়াছেন? সূর্পণখার সেই নির্লজ্জ আচরণে সীতার মত অপ্রাকৃত সাধ্বী নায়িকার মুখে হাসি মানাইয়াছে

কি? এই জায়গায় তো তাঁহার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইবার কথা! মনস্বিনী নারী অন্য নারীর নির্লজ্জ আচরণে লজ্জিত হইয়া থাকে, হাসি দূরের কথা।

তাঁহার এই মন্তব্য শুনিয়া রাধানাথের চৈতন্য হইল। রাধানাথ আত্মদোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন— কবি মাইকেল মধুসূদন এ জায়গায় শুধু সাবধান হইয়া লিখিয়াছিলেন—

স্মরিলে সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা,
তার কথা।

আমার দৃষ্টি সেইদিকে মোটেই যায় নাই।

ভূদেব বলিয়াছিলেন— চরিত্রচিত্রণ ও চরিত্রসংগতি রচনার প্রধান বিষয়। কালিদাসের মত জগৎপূজ্য কবিরও এক-এক জায়গায় পদস্খলন হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা! সাধারণ কবি অলংকারকেই কবিতার প্রধান অঙ্গ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কালিদাসের মত কবির পক্ষে এইরূপ ভুল অমার্জনীয়।

রাধানাথ এই প্রসঙ্গে ভবভূতির কথা তুলিলেন, বলিলেন—ভবভূতির বোধ হয় এইরূপ পদস্খলন কখনও হয় নাই?

ভূদেব সায় দিয়া বলিলেন—ঠিক। কালিদাস ভবভূতির অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভূতি বেশি চিন্তাশীল ছিলেন এবং চরিত্রবিশ্লেষণে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিলেন।

ভূদেববাবু প্রশ্ন করিলেন—তোমার মতে পৃথিবীর কোন্ কবি চরিত্রচিত্রণে সর্বাপেক্ষা কৃতী?

রাধানাথ উত্তর করিলেন—আমার মতে হোমার শেক্সপীয়ার এবং ব্যাসদেব এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী।

ভূদেববাবু বলিলেন, ব্যাসদেবের নাম সকলের শেষে করিলে কেন? এ-বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে অন্য কোনো কবির তুলনাই হইতে পারে না। অন্যান্য কবিদের নায়ক-নায়িকা চিত্র মাত্র, ব্যাসের নায়ক-নায়িকা প্রতিমূর্তি। ব্যাসের নীচে হোমার।

এইরূপ কাব্যালোচনায় উভয়ের দিন কাটিত। কটকে ভূদেববাবু আসিলে স্থানীয় ওড়িয়া ও বাঙালি ভদ্রলোকেরা সভা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। ভূদেববাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রীত হইতেন। একবার রাধানাথ তাঁহাকে স্বরচিত বাংলা কাব্য পড়িতে দেন। কাব্যটি মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের আদর্শে লেখা। পত্রাবলীর নায়িকাদের মধ্যে একজন পৌরাণিক, একজন কাল্পনিক। পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ভুদেববাবু প্রশংসা করিলেন, কিন্তু বলিলেন—পুরানো বিষয় লইয়া শক্তির ও শ্রমের অপব্যয় করিতেছ কেন? তোমার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া খুশি হইলাম, এডুকেশন গেজেটে ছাপাইয়া দিব; কিন্তু আমি আশা করি যে তুমি নূতন জিনিস গড়িবার চেষ্টা করিবে। দেখ, তুমি সুভদ্রার চিত্র আঁকিয়াছ, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিলেও ব্যাসদেবের সুভদ্রার চেয়ে বেশি সুন্দর করিতে পারিবে না। নূতন গড়িবার চেষ্টা কর। তোমার এই পাঁচটি কবিতার মধ্যে যেটি নূতন সেইখানে আদিরসের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে যে মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। আদিরসের এইরূপ অবতারণা নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, সুতরাং বর্জনীয়। উড়িষ্যা অতি সুন্দর দেশ। এ দেশের মনোহর প্রকৃতি কবিতার সম্পূর্ণ উপযোগী। উড়িষ্যা বাস্তবিকই meet nurse for a poetic child। যে দিকেই চাহিবে নূতন গড়িবার যথেষ্ট উপাদান পাইবে।

ভূদেববাবু শুধু সাহিত্যের বিষয়েই রাধানাথকে উপদেশ দেন নাই। জীবনের অনেক ব্যাপারেই তাঁহার কথা শুধু রাধানাথের নয়, আমাদেরও স্মরণীয়। বালেশ্বরের পথে একদিন রাধানাথ অল্পাহারের

প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভূদেববাবু বলিলেন, আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। তুমি সকলকে নিজের মত মনে করিতেছ। এখন লোকে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, জীর্ণশক্তি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে প্রচুর আহার লাভ দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। লোকে অল্পাহারকে এখন ধন্য ধন্য করিয়া থাকে! প্রাচীন আর্য ঋষিরা তো অল্পাহারী ছিলেন না। তাঁহারা যেমন উপবাস করিতে পারিতেন তেমন খাইতেও পারিতেন। নতুবা তাঁহারা মহাভারত-রামায়ণের মত বিশাল কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। এখন আমাদের দেশের লোকেরা যেমন খাইতে পারে না তেমন বই লিখিতেও পারে না।

বালেশ্বরে তাঁহারা রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুরের অতিথি হইয়া তাঁহার বাগানবাড়িতে ছিলেন। একদিন রাত্রে রাধানাথ বাগানের একটা জায়গায় ভূদেববাবুর নিকটে বসিয়া একমনে তারকাখচিত আকাশ দেখিতেছিলেন। ভূদেববাবু তখন কিছু বলিলেন না। পরে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— দেখ, তুমি এত মন দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলে কেন? সর্বদা ওরূপ করা ভালো নয়। ইহাতে নিজে যে অকিঞ্চিৎকর সেই ভাব খুব পরিষ্কার হয়। নিজের অস্তিত্ব প্রায় লোপ হইয়া যায়, লোকে কর্মে উদাসীন হয়। বিরাটের ধ্যান যোগীর পক্ষেই শোভা পায়।

রাধানাথের কর্মপটুতা দেখিয়া ভূদেববাবু বালেশ্বর হইতে ফিরিয়া মন্তব্য করেন—I would further suggest the advisability of making Babu Radha Nath Rai independent Inspector of Orissa and raising his position by increasing his pay. I have now seen that he is quite capable of holding independent charge of a circle and fully endorse the opinion expressed of him by Messrs. Beames and Norman that he is excellently educated, very intelligent and altogether devoted to his duties।

এইরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও অধস্তন কর্মচারীর প্রতি উদারতা ইতিহাসে বিরল। যে বীমস সাহেবের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই সুপ্রসিদ্ধ জন্ বীমস সিভিলিয়ান হইয়া গুজরাটে আসেন, তাহার পর পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইয়া বাংলায় আসেন। তিনি ছয় বৎসর বালেশ্বরের কালেক্টর ছিলেন এবং ১৮৭৫ সালে *Comparative Grammar of Four Languages* নামক পুস্তক লেখেন। তিনি চৌদ্দটি ভাষায় কথাবার্তা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তিনি উড়িষ্যার এবং ওড়িয়া ভাষার অনুরাগী ছিলেন। রাধানাথকে তাঁহার লেখা একাধিক পত্র রাধানাথজীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম-পরিচয়ের এক বৎসর পরে ভূদেববাবু পুনরায় উড়িষ্যায় আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দবাবু ছিলেন। রাধানাথকে লইয়া তাঁহারা কোণারক যাত্রা করেন। সমুদ্রের ধার দিয়া পথ। পূর্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সরো নামে এক প্রকাণ্ড হ্রদ। সমুদ্রতীরে তালপত্রের অবিরাম মর্মরধ্বনি, অসংখ্য হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। পথ হারাইয়া যাওয়ায় অনাবৃত বালুকার উপরে তাঁহাদিগকে রাত্রি কাটাইতে হয়। ভূদেববাবু প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া সম্মুখে একজোড়া বাঘ দেখিতে পান। প্রকৃতির ক্রোড়ে ব্যাঘ্রকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে তিনি ইহার পূর্বে কখনও দেখে নাই। যাহা হউক, কোণারকের অতীতের স্মৃতিস্বরূপ ভগ্নাবশেষের সৌন্দর্য দেখিয়া ভূদেববাবুর চক্ষে জল দেখা গেল। বংশীনাদিনী এক স্ত্রীমূর্তির অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখিয়া ভূদেববাবু মুকুন্দবাবু এবং রাধানাথকে প্রশ্ন করিলেন— এই প্রতিমূর্তি দেখিয়া গ্রীক সাফোর কথা মনে পড়ে না কি?

তখন প্রচণ্ড রৌদ্র, সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত। দেউলের নিকটে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের সুন্দর নবগ্রহ মূর্তি দেখিয়া সকলে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন।

রাধানাথ ভূদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ঐ মূর্তিটি দেখিয়া গ্রীক সাফোর কথা স্মরণ করিলেন। কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে এই মন্দিরের গঠনকার্য গ্রীকরাই সম্পন্ন করিয়াছিল, আপনি নিশ্চয়ই এই মত দেখিয়াছেন।

ভূদেববাবু কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলেন—এইরূপ মত আমি দেখিয়াছি সত্য। কিন্তু আমি তাহার উপর আরও বলিতে চাই, কিছু জুড়িয়া দিতে চাই। গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের কুমারসম্ভব-কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ যখনই অবকাশ মিলিত সাহিত্যের আলোচনায় দিন কাটিত, কোনোদিন বৃথা যায় নাই। ইহার পরে রাধানাথ রায় ভূদেববাবুর সঙ্গে পাটনা বীরভূম গয়া প্রভৃতি জেলায় বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গের আর উল্লেখ করেন নাই। কোণারক হইতে ফিরিবার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি অতিথি হিসাবে কুড়ি-পঁচিশ দিন ভূদেববাবুর গৃহে ছিলেন। রাধানাথ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গৃহের মত গৃহ এবং তাঁহার মত গৃহস্থ প্রায় কোথাওই দেখেন নাই।

১৮৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখের রাধানাথের নিকট লিখিত ভূদেববাবুর এক পত্রে অনেক আলোচনা আছে। রাধানাথের কৃষ্ণার্জুন সম্বন্ধে ধারণার ভ্রান্তি দেখাইয়া ভূদেব বলিতেছেন—আমার মনে হয় না যে তুমি গীতা ও ভাগবত পড়িয়া এখনও ইংরেজি সাহিত্যের ও ইহুদি মনোভাবের পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইয়াছ।

প্রায় দেড় হাজার কথার সমষ্টি এই পত্রখানি ইংরাজিতে লেখা। এখানে বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। ১৮৮২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখের এক চিঠিতে জানিতে পাই যে তিনি পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠাইবার সময় রাধানাথের সহধর্মিণীকে একখণ্ড বহি পাঠাইয়াছিলেন। নাম জানিতেন না বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন 'বাবু রাধানাথ রায়ের স্ত্রী'। এই পত্রের মধ্যেও আলোচনা আছে। তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। রাধানাথ পারিবারিক প্রবন্ধের লেখক যে পুষ্পাঞ্জলির লেখক হইতে পৃথক্ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ভূদেব উত্তরে লেখেন—The position of the essayist and allegorist is the same ; his manner and materials are only different. History and mythology are both of them attempts at the realisation of the ideal, one of the actor and the other of the narrative. · ·To breathe is to know. To know one thing is to know all. The man who said that he knew that he knew not, knew everything and was the wisest man born, not because he was modest in saying what he said, but because he knew the one thing that he knew not.

এই পত্রও ভূদেববাবু ইংরেজিতে লিখিয়াছিলেন ; শুধু শেষে দু-তিন লাইন বাংলাতে। পত্রে ভূদেববাবু রাধানাথকে Dearest Radhanath বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই পত্র হইতেই জানিতে পারি যে রাধানাথবাবুর স্ত্রী ভূদেববাবুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উনি কি সর্বজান !

১৮৮৩ সালের ২৯শে মার্চের একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন—

I should like to know if the পারিবারিক প্রবন্ধ has been at all kindly taken to by your part of the Orissa public. The thing was very much praised by some writer in the CALCUTTA REVIEW and it has had some sale here.

I have been induced by friends to take up to write in form of short essays like those of পারিবারিক প্রবন্ধ an exposition of the real teachings of the *Tantra Shastras.* If I can finish what I am just about to undertake, the second part of Puspanjali which I have had long in contemplation, will not be required. The second part would have been the *Tantric* teachings as the first part has been the *Pauranik.* But it seems that the lighter form of essays is more suited to the Bengali taste of these days than the *Pauranik* form in which our forefathers delighted.

ভূদেববাবুর সূত্রে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাধানাথ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ তারিখে তিনি রাধানাথকে প্রথম পত্র লিখেন। চন্দ্রনাথবাবু হাইকোর্টে ওকালতি করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন, তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন কিন্তু সেখানকার আবহাওয়াও বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, পরে বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ হইয়া কাটাইলেন। তাঁহার প্রথম পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—

"এখন যে কর্মে আছি, তাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। অবকাশ পাই না। লেখা একরকম বন্ধ হইয়াছে। এখন সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে লিখিতেছি, লেখা আবশ্যক বুঝিয়া লিখিতেছি। বেশি অবকাশ ও শারীরিক সামর্থ্য থাকিলে উত্তরচরিত প্রভৃতির সমালোচনা লিখিতাম; তাহা নাই। সুতরাং যতটুকু সময় ও সামর্থ্য আছে, তাহা সমাজ ও ধর্মে বিনিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই দুই বিষয়ে আমার কতকগুলি মনের কথা আছে, সেইগুলি বলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। শকুন্তলাতত্ত্বের পর ফুল ও ফল, ত্রিধারা এবং হিন্দুত্ব এই তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছি। আপনাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিব।

"আমার কথা একরকম বলিলাম। আপনার কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আপনার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনি আমার পরমারাধ্য আচার্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিলেন। আপনার কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। হরপ্রসাদ ও আমি একই বাড়িতে কাজ করি। যদি কখনও এখানে আসেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে · ·।"

রাধানাথ ও চন্দ্রনাথ উভয়কেই ভূদেববাবুর শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ভাবধারার প্রকৃতি তাঁহারা নিশ্চয়ই ভূদেববাবুর নিকট হইতে অনেকখানি পাইয়াছিলেন। বঙ্গ ও উৎকল এই উভয় প্রদেশের সাহিত্যিকদের এই ঘনিষ্ঠ যোগ সাহিত্যের ইতিহাসে উপেক্ষা করিবার নয়।

চিঠিপত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সুকুমার হালদারকে লিখিত

ওঁ

প্রিয়দর্শন সুকুমার

আমার ছেলেবয়সে আমি লোকের মুখে শুনিতাম যে, যে ব্যক্তি হিজলী যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছে সে ব্যক্তি মহাদম্ভে বলে "হাম্ হিজলী যাতা" ; সে যখন কিছুকাল পরে হিজলী হইতে ফিরিয়া আসে তখন সে চিঁচিঁ স্বরে কাঁদো কাঁদো মুখে বলে "হিজ্লী-সে আয়া"—

Government Serviceএ ঢুকিবার সময় তেমনি অনেকে দম্ভের সহিত বলেন যে, আমি গবর্ণমেণ্ট Serviceএ প্রবেশ করিতেছি— কায়ক্লেশে one-third pension তাড়াতাড়ি মুঠাইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় কাতরস্বরে বলেন "আমি Service হইতে রেহাই পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।" পেষণীযন্ত্র তো আর গাছে ফলে না ইহারই নাম পেষণীযন্ত্র।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

বড়মামা

২

ওঁ

প্রিয়দর্শন সুকুমার

তোমার প্রেরিত পত্রিকাবলী খুব আমার কাজে লাগিয়াছে :— আস্‌চে বারের পরের বারের প্রবাসী দেখিও। Literary Guide খানার আগাগোড়া সমস্তটা আমি পড়িয়াছি, তাহা দৃষ্টে England-এর বর্ত্তমান Literary worldএর একটা bird's eye view প্রাপ্ত হইয়াছি। Literary world দুই দলে বিভক্ত— পাদ্‌রির দল এবং Anti-পাদ্‌রির দল। পাদ্‌রির দল যৎপরোনাস্তি benighted, Anti-পাদ্‌রির দল over-rational কিম্বা Rational with a vengeance। This is a direct result of the present war। Real Religion-এর কোনো দোষ নাই— দোষ হচ্ছে পাদ্‌রিদের মূঢ়তা আর Anti-পাদ্‌রিদের অতিবুদ্ধি। Problem হচ্চে—war কেন হয়। কেহই জানে না Providenceএর Precise will wisdom and love কিরূপ— কেননা তাহা জানা অসম্ভব। কিন্তু এটা আমরা সুনিশ্চিত জানি মনুষ্য গভীর অন্তরে সত্য চায়— অসত্য চায় না, peace চায় war চায় না, love চায় hatred চায় না ; গোড়ায় যদি Truth, আনন্দ, love, শান্তি না থাকে তবে মনুষ্যের এ চাওয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। এ চাওয়া কোথা হইতে আসিল— অবশ্য ঈশ্বর হইতে।

Darwinist বলিবেন Evolution হইতে। কিন্তু "evolution" তোমার আমার নিকটে খুব একটা বড় জিনিস হইতে পারে— কিন্তু অসীম জগতের নিকটে এমন কি পৃথিবীর নিকটেও—উহা এক মুহূর্ত্ত-কালের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। The question is কুরুক্ষেত্রতুল্য warএর ঔষধ কি?—ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করা ঔষধ হওয়া দূরে থাক—তাহা কুপথ্যের একশেষ। উভয় Belligerent party মিলিয়া যদি ঈশ্বরের নিকট "অসতো মা সৎ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবির্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" প্রার্থনা করে, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে war থামিয়া যায়। This is the only medicine। যা হো'ক Literary Guide পড়িয়া আমি অনেক উপকার পাইলাম। ইহার পূর্বসংখ্যাক যতগুলা আছে— সবগুলা যদি আমার নিকটে পাঠাও— তবে আমি তোমাকে রাশি রাশি সাধুবাদ, ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ প্রদান করি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

বড়মামা

৩

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রথী,

গাঙ্গুলী সম্বন্ধে পাঁচটা alternative আমার মনে উদয় হয়েছে, যথা :—

1st

আমার হিসাবে আমি ৬০০ দেবো

তোমার হিসাবে তুমি ditto দেবে

2nd

আমার হিসাবে আমি ৮০০ দেবো

তোমার হিসাবে তুমি ৪০০ দেবে

3rd

আমার হিসাবে আমি ৯০০ দেবো

তোমার হিসাবে তুমি ৩০০ দেবে

4th

আমার হিসাবে আমি ১০০০ দেবো

তোমার হিসাবে তুমি ২০০ দেবে

5th

কেবলমাত্র আমার হিসাবে আমি ১২০০ দেবো তোমার কিছুই দিয়া কাজ নাই।

এই পাঁচ alternativeএর যেটা তোমার মনঃপূত হইবে তাহাতেই আমি সম্মত আছি।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

জ্যেঠামহাশয়

তুমি কাজ ফেলে আস্‌তে পারিবে না বলিয়া তোমাকে এইটে লিখে পাঠাচ্চি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমাকে আমার আগ্রহের কারণ বুঝিয়ে বল্‌ব।

৪

অনিলচন্দ্র মিত্রকে লিখিত

"এখনি আসিব" বলো যখন
আস্‌বে যত তুমি জানে তা মন ॥
মুনীশ্বরকে হইবে যেতে।
বোল্‌বে সে "আসবেন খেতে" ॥
তার পরে যাবে কানাই সেন।
বোল্‌বে সে এসে "আসিতেছেন"।
ভাব্‌বো তখন ঘণ্টা চারি
করিলাম আমি কী ঝকমারি।

৫

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

ওঁ

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু
সত্যপ্রসাদ

পথে আসিতে আসিতে রসিক দাসের নিকট শুনিলাম— কতগুলি সামগ্রীর packet আসিয়াছে। কিন্তু তাহা আমি এখনো চক্ষে দেখি নাই— সিংহ-শাবক শান্তি-নিকেতনে গিয়াছেন— তিনি এলে সবিশেষ জান্‌তে পা'ব। বোধ হয় তোমার প্রেরিত আম।

আমের inspiration-এর চোটে কিরূপ কবিতা বেরোয় এখনো তা আমার নিকটে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমের আঁটি গলায় বেধে কোনো ত্রেতাযুগের মহাত্মার মুখ দিয়ে "জয় রাম" বেরিয়ে পড়েছিল— কিন্তু আমের রস গলা দিয়ে নাব্‌লে— শুধু আমের রস হ'লে রক্ষে ছিল, তার সঙ্গে আবার শান্তার ভক্তিরস মেশানো— কি যে আমার মুখ দিয়ে বেরোবে তা আমি জানি নে। শুধু কেবল আ বেরোবে, আর, তার সঙ্গে "রাম"-নামের যোগ হ'লে আরাম হবে ভরপুর। এটা কেবল হনুমানের হ-স্থানে অ; কাজে কিরূপ দাঁড়ায় তা পরে জান্‌তে পাবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
বড়মামা

জুরির ব্যাপারটা সই করে পাটিয়েছি।

৬

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, ৫ সংখ্যকপত্রে উল্লিখিত শান্তা দেবীকে লিখিত

সা ল গ ম - সং বা দ

নাতিনীর নিকট হইতে সালগম উপহার পাইয়া

দাদামহাশয়ের পত্র

সালগম পাইয়া আমি হর্ষে আটখানা,
গান করিলাম সুরু তোম্ তানা নানা ;
পাইতাম যদি কাছে গাউন-পরা বুড়ি
ওয়াল্‌জ-নাচ নাচিতাম মিলাইয়া জুড়ি ।
শান্তা তুমি কান্তা হও যোগ্য রতনের,
তাহলেই খেদ মেটে আমার মনের ।
দিলেন মটন রোষ্ট এস্-পি-জি বাবাজি
চারিধারে সালগম দাঁড়াইল সাজি ;
আঁটিনু দুপাটি দাঁত না করি বিলম্ব,
করিনু তাহার পর কারয আরম্ভ ;
সালগমে মটনে দোঁহে সোহাগে গলিয়া
মুহূর্ত্ত মাঝারে গেল কোথায় চলিয়া ।
কোথায় চলিয়া হায় কোথায় চলিয়া
পেটের কথা পেটেই থাক্—কি হবে বলিয়া ।

দাদামহাশয়

নাতিনীর পত্র

শ্রীচরণেষু

দাদামহাশয়,

খেয়েছ যে সালগম না করিয়া কাল-গম,
এই আমি বহুভাগ্য মানি ;
তার পরে মিঠি মিঠি লিখেছ স্নেহের চিঠি,
তার মূল্য কি আছে না জানি ।
তুচ্ছ এই উপহার কে জানিত কমলার
পদ্ম-সরোবর দিবে নাড়া,
সালগম মটন্ রোষ্টে কবির অধর ওষ্ঠে,
খুলি দিবে কাব্যের ফোয়ারা !

কিন্তু বড়দাদা ভাই বড় মনে দুঃখ পাই,
এ খেদ যাবে না প্রাণ গেলে—
শুনিতে হইল এও ভাগ্যবান্ তোমারেও,
নাচের দোসর নাহি মেলে ॥
না হয় না হল বুড়ি, তবুও তো ঝুড়ি ঝুড়ি
নাতিনীতে ঘরটি বোঝাই,
যারেই লইবে বাছি সেই তো উঠিবে নাচি,
নাচিবার ভাবনা তো নাই।
এ কথা ভুলিলে যবে, বুঝায়ে কি আর হবে
ধিক তবে মোর সালগমে!
বুঝিলাম, তরকারী যত হোক দরকারী,
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে।
আর না করিব ভুল, এবারে বসন্তে ফুল,
তুলিয়া আনিব ভরি ডালা
সালগম পেঁয়াজকলি, জলে দিয়া জলাঞ্জলি,
পাঠাইব বকুলের মালা ॥
তোমার এক নাতনী

দাদামহাশয়ের পত্র

বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সালগমই ভাল,
কাটা ঘায়ে কেন আর লবণাম্বু ঢালো।
গুম্ফ-আক্রমণ-কাব্য উড়াইয়া তোপে
কলপ লাগাতে হল দাড়ি-চুল-গোঁপে।
দাঁতের জন্য ভাবি নে — বেলকুল ফাঁক্,
তথাপি হাসিতে ভাঙে বিদ্যুতের জাঁক্;
গজাইয়া উঠিয়াছে দু-পাটি সুন্দর,
তার সাক্ষী বেয়া'য়ের শ্রীমুখ-কন্দর।
শান্তা জানি পদ্মিনীরে দিয়াছিনু নাড়া,
কিন্তু এবে দেখিতেছি গতিক বেয়াড়া।
যে মকরন্দের বৃষ্টি! মিষ্টিতে মজিল সৃষ্টি!
বুড়দার শুন পরামর্শ।
মকরন্দ অত ব্যয়, আগে ভাগে ভাল নয়,
ধৈর্য্য ধর তুই এক বর্ষ ॥

আসিবে যখনি অলি, সাধিবে কত কি বলি,
তার জন্য এই ব্যালা থেকে
জমাইয়া মকরন্দ, করি রাখো চাবি বন্ধ,
নহিলে শিখিতে হবে ঠেকে।
এবে মোর বর সাজা, নিতান্ত কঠিন সাজা
তা নহিলে — ফুলমালা বদলি',
অলি যে আসিবে মাতি ফুলায়ে বুকের ছাতি
দেখাতেম তাহারে কদলী।

দাদামহাশয়

৬-সংখ্যক পত্রাবলী ১৩০৯ ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত, পত্রগুলি ভারতীতে বেনামী ছাপা হইয়াছিল। 'নাতিনীর পত্র' প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনা; দাদামহাশয়ের নিকট হইতে কবিতায় চিঠি পাইয়া বিপন্ন নাতিনী, অন্য দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন—কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামেই, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার চিঠির অন্তর্গত হইয়া ১৩৫৮ আষাঢ়-সংখ্যা 'কথাসাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে—'এতদিন অতিথি ছিল বলে সময় পাইনি। শান্তার জন্যে উত্তর লিখে পাঠালুম—আজ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (বা "এস. পি. জি)" সৌদামিনী দেবীর পুত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়; শান্তা সত্যপ্রসাদের কন্যা।

৩-সংখ্যক পত্র এক দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথের অর্থের প্রতি ঔদাসীন্য, অপর দিকে তাঁহার প্রার্থী-বাৎসল্যের নিদর্শন। কথিত আছে, কোনো বিপন্ন ব্যক্তিকে নগদ টাকার অভাবে তাঁহার গাড়িঘোড়া দান করিয়া দিয়াছিলেন। পৈতৃক জমিদারি পরিচালনা-কালে তাঁহার পরদুঃখকাতরতার প্রকাশ সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে।

গত মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের তিনখানি ইতিপূর্বে 'দেশ' ও 'শান্তিনিকেতন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতার জন্য পুনর্মুদ্রিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের অপর একখানি চিঠি ১৩৪৬ চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান

বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' -শীর্ষক একটি প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ পূর্বপ্রচলিত (বিশেষতঃ হিন্দি বৈঠকী) কোনো কোনো গানের অনুসরণে যে-সব গানে সুরযোজনা করিয়াছেন তাহার আলোচনা করেন এবং একটি তালিকা (উক্ত সংখ্যার পৃ ২০৯-২১৪) প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হইবার পরে আরও কতকগুলি গান সম্পর্কে জানা গিয়াছে বা অনুমিত হইয়াছে যে, সেগুলিও পূর্বপ্রচলিত কতকগুলি গানের আদর্শে রচিত। পূর্বপ্রকাশিত তালিকা যাহাতে পূর্ণতর হয় এজন্য সেই গানগুলির তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল। এই তালিকা-সংকলনে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি এবং শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কতকগুলি স্বরলিপির খাতা বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। বর্তমান তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে নিমিত্তকারণ হইলেন শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়া ও মন্তব্য জানাইয়া সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। —সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

হিন্দি-ভাঙা গান

বাংলা গান	মূল হিন্দি গান	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
আইল শান্তসন্ধ্যা	ভাওয়েরে ভস্ম	শ্রীরাগ-চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
আজি রাজ আসনে	প্যারি তেরে পায়ন পকরু	বেহাগ-ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
আয় লো সজনি সবে	আজু মোরন বন	মল্লার-কাওয়ালি	শতগান
আনন্দ তুমি স্বামী		ভৈরবী-সুরফাঁকতাল[৩]	
উঠি চলো সুদিন আইল	উঠি চলে সুদিন নাচত	কেদারা-সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
এই-যে হেরি গো দেবী / একি করুণা করুণাময় [১]	নইরে মা বরণ	বাহার-আড়াঠেকা[৩]	
এখনো তারে চোখে দেখি নি	পায়েলিয়া মোরে বাজে	ইমন-কাওয়ালি[৪]	শ্রীইন্দিরা দেবী
ও কী কথা বল সখি[২]		দেশখাম্বাজ-ত্রিতাল[৩]	
ওগো, দেখি আঁখি তুলে	গর্ য়ার্ নহো সাকি	মিশ্র সুরট-দাদ্রা[৩]	শ্রীইন্দিরা দেবী
কাছে তার যাই যদি		জয়জয়ন্তী-কাহার্বা[৩]	
কোথা ছিলি সজনি লো[২]		ভৈরবী-ত্রিতাল[৩]	
জননী তোমার করুণ চরণখানি		মিশ্রগুণকেলি-নবপঞ্চতাল[৩]	

তুমি কিছু দিয়ে যাও	কৈ কছু কহরে	খাম্বাজ-কাহারবা[৩]	
তোমা-হীন কাটে দিবস	তুম বিন কৈসে	বাগেশ্রী-আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুঃখরাতে হে নাথ	রঙ্গরাতি মাতিয়া	সরফর্দা-আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
নিত্য নব সত্য তব	জ্ঞানরঙ্গ ধ্যানরঙ্গ	শুক্লবিলাবল-ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বিদায় করেছ যারে	বাজে ঝননন মোর পায়লিয়া	কানাড়া-ঝাঁপতাল[৩]	শ্রীইন্দিরা দেবী
ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহন লিয়ে বন	ভূপালি-মধ্যমান[৩]	
ভাসিয়ে দে তরী[২]		জয়জয়ন্তী-†কাওয়ালি[৩]	
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে	হস হস গরওয়া লগাবে	ভৈরবী-যৎ	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মহাবিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমনকল্যাণ-তেওরা	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
যাওয়া আসার এই কি খেলা	প্রেম ডগরিয়াঁমে ন করো	গান্ধারী-ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা (২)
স্বপন যদি ভাঙিলে[৫]	কহে ন তুম জাবত	রামকেলী-একতালা	শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
হরষে জাগো আজি	হরষ জাগো লাল	হাম্বীর-ধামার	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
হা কী দশা হল আমার	হাল মে রবে রবা	বেহাগখাম্বাজ-ত্রিতাল	শ্রীইন্দিরা দেবী
হা কে বলে দেবে মোরে[২]		পিলু-†কাওয়ালি[৩]	
হৃদয়-আবরণ খুলে গেল[১]	নইরে মা বরণ	বাহার	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি

বিলাতি সুর - ভাঙা গান

বাংলা গান	মূল গান
আহা, আজি এ বসন্তে	Go where glory waits
তবে আয় সবে আয়	অজ্ঞাত

১ দ্রষ্টব্য : হৃদয়-আবরণ খুলে গেল ; তাহারই পাঠান্তর : একি করুণা করুণাময়। এই সুরে কিন্তু ভিন্ন তালে ভিন্ন গান : এই-যে হেরি গো দেবী।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় সর্বদাই সংকেতে সুরকারের নাম আছে। যে-গুলিতে নামের উল্লেখ নাই সেগুলির প্রায় সবই, অন্য পুস্তকাদির প্রমাণে দেখা গিয়াছে, হিন্দিভাঙা। বর্তমান গানগুলির সম্পর্কে অন্য কোনো সূত্রে এখনো কিছু জানা যায় নাই, তবু 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় সুরকার অনুল্লিখিত থাকায় সম্ভবতঃ হিন্দিভাঙা এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

৩ বাংলা গানের রাগ-তাল।

৪ স্বরলিপি-গীতিমালায় উল্লিখিত সুর। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে এই গানের সুর রবীন্দ্রনাথেরই রচিত।

৫ পূর্বমুদ্রিত তালিকায় থাকিলেও, মূলের উল্লেখ ছিল না।

† পূর্বপ্রচলিত কাওয়ালি তালকে অধুনা ত্রিতাল বলা হয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬, পৃ ২০৯-২১৪) প্রকাশিত পূর্বোক্ত তালিকায় কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছিল ; তালিকা-নিবিষ্ট সংখ্যা-অনুসরণ করিয়া তাহার সংশোধন নিম্নে দেওয়া গেল।

৬২ সংখ্যক গান 'ডাকি তোমারে কাতরে'— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

১০৩ সংখ্যক গান 'প্রথম কারণ আদি কবি' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এ বিষয়ে শ্রীশুভ গুহ ঠাকুরতা আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৪০ সংখ্যক গান 'কী ভয় অভয় ধামে'— শঙ্করা স্থলে বেহাগ হইবে।

৪৬ সংখ্যক গান 'কোলাহল ছাড়িয়ে' স্থলে 'ভবকোলাহল ছাড়িয়ে' হইবে।

৪৯ সংখ্যক 'গহন ঘন বনে' গানটির মূল হিন্দি গান 'আলি রি গরজত' স্থলে 'সঘন ঘন বঙ্ক' এবং প্রাপ্তিস্থান সঙ্গীতমঞ্জরী স্থলে জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইবে।

১১৭ সংখ্যক 'মন জানে মনোমোহন' গানটির মূল হিন্দি গান 'জান সব জগজন' স্থলে 'মন মানো' হইবে। প্রাপ্তিস্থান, গীতসূত্রসার (২)।

১৪৯ সংখ্যক 'হিয়া মাঝে গোপনে হেরিয়ে' গানটির মূল হিন্দিগান 'পিয়া বিদেশ গয়ে'— ভৈঁরো স্থলে পিলু হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'জমিন্দারী পঞ্চায়ত সভা'

কলিকাতা ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীটে "জমিন্দারী পঞ্চায়ত সভা" স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশের কতিপয় প্রধান রাজা, জমীন্দার ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণের যত্নে জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সৃষ্টি। সভার উদ্দেশ্য ছিল এই পাঁচ প্রকার—(ক) বিবাদ-মীমাংসা। (খ) সর্ব্বপ্রকার ভূম্যাধিকারিশ্রেণীর মধ্যে ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপন। (গ) জমীন্দারী কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি। (ঘ) কৃষিসম্পত্তির এবং ভূম্যধিকারিবর্গের অবস্থার উন্নতি। (ঙ) ভূম্যধিকারিবর্গের সন্ততিগণের অবস্থোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা। সভার সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভা স্থাপনের প্রায় দুই বৎসর পরে সভার মুখপত্রস্বরূপ "জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা" ১২৯৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৯১) প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সহকারী সম্পাদক, যোগেন্দ্রনাথ বসু এম. এ., বি. এল.

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; "পত্রিকার ও বিজ্ঞাপনের মূল্য সংক্রান্ত টাকাকড়ি ও কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত পত্রাদি জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উক্ত ঠিকানায় [কার্য্যালয় ৯২ বহুবাজার ষ্ট্রীটে] পাঠাইতে হইবে।"

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে' উল্লিখিত 'পঞ্চায়ত' প্রসঙ্গে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯

বিষয়সূচী

চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১
শিল্পপ্রসঙ্গ	শ্রীনন্দলাল বসু	৫৪
দেশ ও কাল	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫৭
বঙ্গদেশে প্রভাকর মীমাংসার চর্চা	শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৬১
কবি বিদ্যাপতি	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	৬৭
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	৮৭
	শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার	৯৪
আলোচনা		
রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান		৯৯
চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০০
স্বরলিপি	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৪

চিত্রসূচী

মৎস্যগন্ধা	শ্রীনন্দলাল বসু	৫১

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা
কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯

চিঠিপত্র

স্বর্ণকুমারী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[লণ্ডন। পোস্টমার্ক ৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২]

ভাই নদিদি

জাহাজে যতদিন চলেছিলুম যথেষ্ট সময় পেয়েছিলুম সেই সময় অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখ্‌তে পেরেছিলুম। এখানে এসে হঠাৎ যথেষ্ট সমাদর পেয়েছি কিন্তু সময় পাইনি। তাই এখানে লেখা বড় এগয়নি। কেবল এখানকার লোকের তাড়ায় নিজের কবিতা নাটক প্রভৃতির ইংরেজি তর্জ্জমা অনেকগুলি করেছি। প্রথম প্রথম এখানে আমার শরীর ভালই ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে তেমন ভাল বোধ হচ্চেনা—তাই আজকাল লেখা বন্ধ আছে। শরীরটা আবার সেরে উঠ্‌লে ভারতীর জন্যে একটা কিছু লেখা পাঠিয়ে দেব।

মণিলালকে [১] আমি কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক অ্যাণ্ডার্সনের[২] ঠিকানায় আমার কতকগুলো বই পাঠাতে বলেছিলুম, কিন্তু বোধহয় মণিলাল সেগুলো পাঠায়নি। কেননা পেলে অধ্যাপক আমাকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পাঠাতেন। তাকে তুমি একটু তাড়া দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো। নইলে অ্যাণ্ডার্সনের কাছে আমাকে অপ্রস্তুত হতে হবে।

আমার কতকগুলি কবিতার গদ্য তর্জ্জমা করেছিলুম সেগুলো এদের খুব ভাল লেগেছে—ছাপতে দিয়েছে—বোধহয় অক্‌টোবরের শেষাশেষি বই বের হতে পারবে। আমার ছোট গল্পের তর্জ্জমাও এরা ছাপতে চাচ্চে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এবার এদের দেশে গরমিকালে গরম হলই না। কেবলি বৃষ্টিবাদল এবং শীত চলেছে। সেপ্টেম্বরে ঠিক ডিসেম্বরের মত ঠাণ্ডা পড়েছে। সকলে আশঙ্কা করচে খুব বেশি শীত হবে। আমরা নবেম্বরে আমেরিকায় যাওয়া স্থির করেছি।

জ্যোতিদাদার ছবির খাতা[৩] এখানকার কোনো কোনো আর্টিষ্ট্ দেখে খুব প্রশংসা করচে। এরা বলে ওঁর drawing একেবারে প্রথমশ্রেণীর ওস্তাদের হাতের-উপযুক্ত। এখানকার কাগজে ভাল লোক দিয়ে ওঁর ছবির সমালোচনার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে। এঁরা বল্‌চেন, উচিত ওঁর ছবির একটা selection ছাপাতে। ছবি ছাপানো ভয়ানক খরচ। অন্তত হাজার দেড়েকের কমে হতেই পারেনা। জ্যোতিদাদাকে লিখেছি যদি কিছু টাকা পাঠাতে পারেন তাহলে ছাপবার ব্যবস্থা করা যায়।

তোমার রবি

২

ওঁ

ভাই নদিদি

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা তোমাদের ভাল লেগেছে শুনে খুসি হলুম। ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলো তর্জ্জমা করে ফেলেছি সেগুলোও এখানকার লোকের ভাল লেগেছে এবং ম্যাকমিলানরা ছাপাবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে। আমি এখন পথে। শিকাগো সহরে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল সেইটে শেষ করে রচেষ্টারে চলেছি—সেখানে Religious Liberalsদের এক Congress meeting[৪] হবে, সেখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে—আজ সেখানে যাত্রা করচি। সেখান থেকে বষ্টন প্রভৃতি দুই এক জায়গায় ঘুরে এখানে ফিরে আসব। এ দেশটা এত প্রকাণ্ড যে এক সহর থেকে আর এক সহরে যাওয়া বৃহৎ ব্যাপার। কলকাতা থেকে বম্বাই সহরে বক্তৃতা করতে যাওয়া যেমন, আমার পক্ষে আর্ব্বানা থেকে রচেষ্টারে যাওয়াও তেমনি। এখানকার খুব দ্রুতগামী ট্রেনেও প্রায় কুড়ি ঘণ্টা লাগ্‌বে।

এখানে রথী তার কলেজে একটা Post Graduate Course নিয়েছে— সেটা সমাধা করতে তার আর তিন মাস লাগবে। সেইটে শেষ করে তার পরে মে মাসে আমার ইংলণ্ডে ফেরবার কথা আছে। সেখানে আমার লেখাগুলো ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বউমার এ জায়গায় বেশ চল্‌চে। সকলেই ওঁকে খুব ভালবাসে। ওঁর একটা গুণ আছে উনি কিছুমাত্র nervous নন। অপরিচিত লোকদের মধ্যে অপরিচিত জায়গায় বেশ নিঃসঙ্কোচে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করতে পারেন। অথচ আমাদের আধুনিক মেয়েরা যে রকম একটু সুর চড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বৌমার সে ভাব একেবারেই নেই, খুব শান্তধীর আত্মসমাহিত ভাব— সেইটে এদেশের পক্ষে একটু নূতন এবং এরা সেটাকে ভারতবর্ষের মেয়েদের একটি বিশেষ গুণ মনে করে খুব আদর করে। ইংরেজি কথাবার্ত্তাও বৌমা একরকম কাজচালানো রকম করে চালিয়ে দিতে পারেন। নানা দেশ দেখে নানাবিধ লোকের সংসর্গে এসে ওঁর পক্ষে এই ভ্রমণটা খুব একটা শিক্ষা হচ্চে।

তোমার বই আমি ঠিক আমেরিকায় আসবার দিনে রেলোয়ে ষ্টেশনে পেয়েছি। তুমি জাননা এখানে কোনো বই প্রকাশ করা কত কঠিন। অবশ্য নিজের খরচে ছাপানো শক্ত নয় কিন্তু কোনো প্রকাশক, পাঠকদের কাছ থেকে বিশেষ সমাদরের সম্ভাবনা নিশ্চিত না বুঝলে নিজের খরচে ছাপাতে চায় না। এখানকার অনেক বই গ্রন্থকারের খরচে প্রকাশ হয়। আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তা ছাড়া তর্জ্জমা খুব যে ভাল হয়েছে তা নয়— অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌছয় নি।

আমার জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি[৫] এখানে সকলেই খুব প্রশংসা করচেন। গগনের উচিত তাঁর অন্য ছবিগুলি একটা পোর্টফোলিয়ো আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। ইতি ২৮ জানুয়ারি [১৯১৩]

তোমার স্নেহের

রবি

৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন, এপ্রিল ১৯২৫]

ভাই নদিদি

এখানে এসে অল্প একটু ভালো আছি। কিন্তু এখনো নড়াচড়া প্রায় বন্ধ— কেদারার মধ্যে সমস্ত দিন স্তব্ধ হয়ে আছি। য়ুরোপে যাত্রা পর্য্যন্ত এই রকমই কাটবে। সেখানকার হাওয়ায় শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে এই আশা করে আছি। এখানে এবার এখনো গরম পড়ে নি— প্রায় মাঝে মাঝে মেঘ করে আসচে। রাত্রিটা বেশ রীতিমত ঠাণ্ডা থাকে। প্রণাম।

তোমার রবি

শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২ ডক্টর জে. ডি. অ্যাণ্ডার্সন বা 'ইন্দ্রসেন'। কেম্ব্রিজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো আলোচনা ইঁহারই পত্রের উত্তরে লিখিত।

৩ এই সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে 'চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্রষ্টব্য।

৪ এই সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ("Race Conflict") মডার্ন রিভিউ পত্রের ১৯১৩ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত। ইহার অজিতকুমার চক্রবর্তী -কৃত অনুবাদ জাতি-সংঘাত প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) ও প্রিয়ম্বদা দেবী -কৃত অনুবাদ "জাতি-বিরোধ" ভারতী পত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) মুদ্রিত হয়।

৫ জীবনস্মৃতির প্রথম সংস্করণ (১৩১৯) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ২৪ খানি চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

শিল্পপ্রসঙ্গ

শ্রীনন্দলাল বসু

একটি আলোচনা

পূজনীয় গুরুদেবের সঙ্গে যখন আমি চীন দেশে গিয়েছিলাম, তখন একদিন গুরুদেবের আহ্বানে সেখানকার সব বড়ো বড়ো শিল্পীদের সমাগম হয়েছিল। তখন গুরুদেব বললেন, নন্দলাল, এ তোমার জীবনে পরম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তোমার শিল্পের বিষয় যা জানবার আছে এই সব মনীষীদের কাছে জেনে নাও।

আমি প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম, শিল্পীদের সঙ্গে সমাজের যোগ কোথায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভালো শিল্পীরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন কী ক'রে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর॥ শৌখিন (amateur) শিল্পী সমাজের আনন্দ যোগান, যা সমাজের প্রাণ। অথচ শুধু আনন্দের জন্যে শিল্পসৃষ্টি করেন ব'লে তাঁরা স্বার্থশূন্য ও নির্লিপ্তভাবে তা দিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর॥ শৌখিন শিল্পীদের জীবনযাত্রানির্বাহে কোনো চিন্তার কারণ নেই। এই ক'জন হলেন সম্মানজনক শৌখিন শিল্পী-পদের অধিকারী (১) হয় তিনি দেশের রাজা, নয় রাজ্যের বড় কর্মী, মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ বা এইরকম কিছু (২) নয় বড় জমিদার বা ব্যবসায়ী (৩) নয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। এঁরা সমাজকে, স্বার্থশূন্যভাবে ও স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা ক'রে, নিজ সাধনার ফল দিতে পারেন। কারও খাতিরে তাঁরা নিজ মত বদলান না। কেবল নিজ সাধনার দ্বারা স্বমত গঠন করেন। এঁরা দেশের শিল্পের ঐতিহ্য বদলে দিতে পারেন। কারণ, এঁরা নিন্দাস্তুতির বহু ঊর্ধ্বে; আর সাধনার দ্বারা সত্যের সন্ধান ও আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন বলে এরূপ করতে সমর্থ। এইসব শিল্পীদের পক্ষে শিল্পের দ্বারা অর্থোপার্জন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পেশাদার শিল্পীদের স্থান শৌখিন শিল্পীদের নিম্নে; কারণ তাঁদের কতকটা সমাজের মনোরঞ্জন ক'রে অর্থোপার্জন ও সম্মানলাভ করতে হয়। পেশাদার শিল্পীদের শিল্পের নানা কৌশল (technique) আয়ত্ত করতে হয়। কারণ, জনসাধারণ প্রায়ই ঐসব ক্রিয়া-কৌশলের দক্ষতার নিরিখেই শিল্পকর্মের বিচার করেন। তবে ইচ্ছা করলে, পেশাদার শিল্পীও স্বাধীন শৌখিন শিল্পী হ'তে পারেন। তবে তখনই তা সম্ভবপর যখন তাঁরা সমাজের ও সংস্কারবদ্ধ অ্যাকাডেমিক শিল্পীদের সমালোচনার ভয় থেকে, অর্থোপার্জনের তাগিদ ও মোহ থেকে মুক্ত হন। এই সব শৌখিন ও পেশাদার শিল্পী ছাড়াও আর দু রকমের শিল্পী চীনের সমাজে আছে। এক হ'ল পোটো অর্থাৎ যাঁরা কয়েকটিমাত্র ছবি বারবার নকল ক'রে অর্থোপার্জন করেন, কোনো মৌলিক ছবি করতে পারেন না। আর-এক হল 'জালিয়াত' শিল্পী, তারা বড়ো শিল্পীদের ছবি নকল করে, আর তাদের নাম ও শীলমোহর ব্যবহার ক'রে সমাজকে ঠকিয়ে অর্থোপার্জন করে।

একখানি চিঠি

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার লেখা ২৯-৪-১৯৫২ তারিখের পত্র পেলাম। তাতে শিল্প বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন; সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। আপনার প্রশ্ন হল—

(১) আর্ট্ শিখিতে হইলে কোনো চাকুরি করিয়াও শেখা যায় কি না।

(২) আর্টের শেষ সীমায় পৌঁছানো যায় কি না।

(৩) 'যদি যায় তাহা হইলে সেইরূপ কোনো অনুকরণীয় জীবনীর কিয়দংশ অনুসরণ করিবার জন্য পাঠাইলে সান্ত্বনা পাইব। কারণ আমিও চাকুরি করিয়া [কিরূপ চকুরি ?] আর্ট শিখিতেছি কিছুদিন হইল [নিজে নিজে বা কাহারও কাছে ?]।'

(৪) আর্টের ভিতর দিয়া ঈশ্বর লাভ করা যায় কি না।

(১) চাকরি করতে করতে বা যে-কোনো অর্থকরী বিদ্যা শিখতে শিখতে আর্ট্ শেখা যায়। তবে দেখতে হবে, শিল্পে শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে কি না। যে কাজ করতে করতে শিল্পসাধনা করতে চান সে কাজ করার পরও শিল্পীর শারীরিক ও মানসিক শক্তির কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কি না।

(২) আর্টের শেষ সীমায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু খণ্ড সীমায়, দেশ কাল পাত্র হিসাবে। তবে শিল্পে স্বাভাবিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা থাকা চাই; তা না হ'লে, কালে ধৈর্যচ্যুতি ও লক্ষচ্যুতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। শিল্পসাধনা কিম্বা সংসারপ্রতিপালন দুটার মধ্যে যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তারই শেষ প্রান্তে পৌঁছানো গিয়েছে, অবশেষে এই দেখা যাবে। ঐকান্তিক অনুরাগ থাকলে আর্টে লক্ষচ্যুতির সম্ভাবনা কম।

শিল্পসাধনার শেষ সীমা কিছু নেই। যেমন আনন্দ-উপলব্ধির সীমারেখা টানা যায় না। আনন্দ বা রসানুভূতির স্বরূপ অনির্বচনীয়। তার ইতি নেই। কখনও তার তারতম্যও হয় না। আনন্দ-উপলব্ধি ও রসবোধ যতই গভীর হ'তে থাকে ততই তার বিরাট ও সর্বত্রগামী সত্তার অনুভূতি তার সীমাবদ্ধ আশ্রয় বা উপলক্ষ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। এই আনন্দ বা রসানুভূতির গহন কন্দরে পৌঁছনোর একমাত্র পথ শ্রদ্ধা ও আস্তিকতা। শিল্পী প্রথম থেকেই সমালোচকের চোখে ছবি দেখতে আরম্ভ করলে ধন্দ বাড়তে থাকবে। শেষে হয়তো দেখা যাবে, সার ছেড়ে অসারে তার মগজ বোঝাই হয়েছে। অর্থাৎ, শিল্পী বনেছেন সমালোচক বা ঐতিহাসিক। এ যেন শিব না হয়ে মানুষের পিতামহ হওয়ার দুর্ঘটনা ঘটেছে। আনন্দ ও রসের সম্যক্ বোধের জন্য প্রিয়দর্শী ভালো সমালোচকদের লেখা পড়তে হবে। এমন লেখা অবশ্য দুর্লভ নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, প্রথমে ভারতীয়-সংস্কৃতি-বেত্তা প্রিয়দর্শীদের গ্রন্থাবলী প'ড়ে পরে বিদেশীয়দের তথা বিদেশী শিল্পের সমজদারদের বই পড়লে ভালো হয়। কিছুতেই ভুলবেন না, আমরা ভারতীয়, আমাদের চোখ ভারতবর্ষের আলোতেই উন্মীলিত হয়েছে এবং আমাদের মন ভারতেরই স্তন্যরসধারাপুষ্ট।

প্রিয়দর্শী, যিনি শ্রদ্ধাশীল ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন; যিনি শিল্পের গুণাবলী আগে দেখেন, তার পর তার অগুণের বিচার করেন।

আর একটি কথা, নামজাদা পুরাতন ও নূতন ভালো শিল্পীর ছবি হামেসাই দেখতে হবে। ছবি যদি

মৌলিক হয় সে সবচেয়ে ভালো। যাঁরা বহুদিন ধরে (অন্তত বিশ বৎসর ধরে) নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাযথ শিল্পসাধনা করছেন দেশকাল ও শৈলী বা স্টাইল -নির্বিচারে তাঁদের সঙ্গ করতে হবে।

(৩) চাকরি বা অন্য কাজ করতে করতে শিল্পসাধনার শেষ সীমানায় পৌঁছেচেন তেমন জীবনের দৃষ্টান্ত বিরল। আমাদের দেশে সেরূপ শিল্পীর জীবনীর বড়ো অভাব। চীন বা পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে ভাগ্যবান। চীনা বা বিলিতি শিল্পীদের জীবনী পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই নে, খবরও রাখি নে। ঐরকম জীবনের সন্ধান করার দরকারও আমার হয় নি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা থাকায় সৌভাগ্যক্রমে গুরু বলে যাঁকে প্রথমে বরণ করেছিলাম তাঁর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসই আজীবন আমার পথপ্রদর্শক হয়েছে। ভারতে ঐরূপ শিল্পীর জীবনী না থাকলেও সাধু, সন্ত, সঙ্গীতজ্ঞ মহাপুরুষদের জীবনকথার অভাব নেই। তাঁদের জীবন ও তাঁদের সাধনার ইতিহাস এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করবে। আর দেখে থাকবেন, অনেকে চাকরি বা অন্য কাজ করেও হয়তো সঙ্গীতের চর্চা করে থাকেন এবং তাতে আনন্দও পান ঢের। তাঁরা নাম যশ বা অর্থাগমের পন্থারূপে এই অতিরিক্ত সাধনায় ব্রতী নন, শখের বা নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য এইসব চর্চা করেন। শিল্প শেখায় শিল্পীর স্বাভাবিক প্রীতি বা রসবোধ থাকা চাই। কেবল চেষ্টা করে বা জোর করে শখ বা রসবোধ জাগানো যায় না; যেমন ধরে বেঁধে ভালোবাসানো কখনও সম্ভবপর হয় না। এ হ'ল অশিক্ষিতপটু সহজাত সংস্কার। লোক-দেখানো ভালোবাসা ভণ্ডামির চূড়ান্ত। নামের মোহে বা অর্থের লোভে ভালোবাসা ঘৃণার যোগ্য; তাতে নিজের বা অপরের কারোরই তৃপ্তি হয় না, বরং আখেরে হয় চরম মর্মঘাতী। শিল্পীর অনুরাগ ও নিষ্ঠা থাকলে শিল্পের অনেকখানি স্ববলেই তাঁর আয়ত্তে এসে যায়। ছোটো ছেলেরা কেমন করে ছবি আঁকে, আদিম যুগের লোকেরা কেমন ক'রে সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন, তা দেখলে মনে বিস্ময় জাগে। তবে একটা শিল্পপরিবেশের মধ্যে থাকলে বড়ো সুবিধা হয়।

রসসৃষ্টি করাতেই শিল্পের সার্থকতা। শিল্পরচনায় রসসৃষ্টি ও আঙ্গিকের দক্ষতা সমান দরকারী হলেও রস হ'ল মুখ্য, আর আঙ্গিক হ'ল গৌণ। ইমারত ও ভিৎ, প্রাণ ও দেহের মতো অন্যোন্যমুখী নিত্য সম্বন্ধ, আবার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

তাঁকে পাওয়া তো চাই। তবে তাঁকে সত্যিই কি পেতে চাই? আপ্ত বাক্য হ'ল, সত্যই তাঁকে চাইলে পাওয়া যাবে। এখানে কথা আসে শিল্পীর যে ঈশ্বর তাঁর স্বরূপ কী। শিল্পী আমরা আমাদের শিল্পভাবনায় তাঁকে পেতে চাই রসরূপে, আনন্দরূপে। ঈশ্বরের স্বরূপ কী তা কেমন ক'রে বলব। জনাবার তো বুদ্ধি নেই। তবে সার কথা এই বুঝি, আনন্দ পেতে চাই।

দুটি স্কেচ্ চেয়েছেন। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। এখন বুদ্ধি সচল, কিন্তু মন তার কাজের বোঝা নামিয়ে বিস্রস্ত হয়ে বিশ্রামরত। ইতি

দেশ ও কাল

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দেশ আর কাল, এ দুটি হল সৃষ্টির সবচেয়ে আদি ব্যবস্থা, সৃষ্টির মূল কাঠামোই এ দুটি দিয়ে। আমরা জানি, চোখে দেখি, সব জিনিস আছে এবং ঘটে দেশে ও কালে। দেশ নাই, কাল নাই, অথচ বস্তু আছে— এ রকম অবস্থা বা ব্যবস্থার কথা অধ্যাত্মবাদীরা বলে থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয় তা নয়। আমরা বলছি এই স্থূলের কথা, জড়জগতের কথা, জড়জগতের মধ্যে যা-কিছু আছে তার কথা— যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ— এই গতিসমষ্টির মধ্যে যা-কিছু গতিময় সেই জিনিস। এখানে সবই দেশ ও কাল পরিচ্ছিন্ন। এ দুটি যেন যুগল বাহন বা আধার, দুটিতে মিলে গড়েছে বিশ্ববস্তুর আদি আশ্রয় ও অবলম্বন— আত্মারই মত এদের সম্বন্ধেও বলতে পারি, এতৎ আলম্বনং শ্রেষ্ঠং এতৎ আলম্বনং পরম্। সাধারণ বোধে তাই দেশ কাল হল স্বতন্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা। কারো উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, তাদেরই উপর নির্ভর করে আর-সকলের অস্তিত্ব। এ হল স্থির নির্দিষ্ট নিশ্চিত জিনিস— একটা সুদৃঢ় অনড় পট, আর তার উপর আঁটা রয়েছে বস্তু ও ঘটনা সব। বস্তু বা ঘটনাবলীর গুণকর্মের উপর এই যুগ্মসত্যের সত্যতার ব্যতিক্রম কিছু হয় না। তাছাড়া এ দুটি যুগ্মসত্য বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই আবার নিজের নিজের সত্যে ও সত্তায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ; তারা পরস্পরকে ধরে আছে বটে, অচ্ছেদ্যভাবে— কিন্তু একের স্বকীয়তা অন্যটির উপর নির্ভর করে না।

একটি জিনিসের অস্তিত্ব অর্থাৎ একটি জিনিস আছে বলতে বুঝি তাহলে তা আছে একটি বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ কালে, অর্থাৎ চতুর্দিকবিস্তৃত অসীম প্রসারের মধ্যে তা হল একটি বিন্দু এবং পৌর্বাপর্যের অনন্ত ধারাবাহিকতার একটি ক্ষণ। দেশের প্রসারে স্থান বৈজ্ঞানিকেরা নির্দেশ করে থাকেন তিনটি রেখা ধরে : ১. দ্রষ্টার দৃষ্টিরেখা হতে কতখানি উপরে বা নীচে, ২. দ্রষ্টার দক্ষিণে না বামে কতখানি, আর ৩. দ্রষ্টার সম্মুখে সোজা কতদূরে ; অন্য কথায়, লম্ব, তির্যক আর বেধ রেখা এই তিনটির সংযোগ যেখানে তাই হল জিনিসের স্থান বা স্থিতি। মাপের জন্য দ্রষ্টা ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ স্থিরবিন্দুও গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থিতির এই যে কাঠামো তার মূলরূপ দিয়েছিলেন ফরাসী দার্শনিক ও গাণিতিক দেকার্ত (Descartes), তাই এর নাম cartesian co-ordinates, আমরা বলতে পারি, কার্তেজীয় রেখাঙ্ক। তার পর জিনিস এক জায়গায় থাকে না, তার স্থিতির অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায়, রেখাঙ্কের পরিবর্তন হয়। এক স্থিতি হতে আর-এক স্থিতিতে পরিবর্তনের মধ্যে যে অবকাশ তারই নাম কাল। কাল-মুহূর্ত বা ক্ষণ যদি জানা থাকে, আর জানা থাকে সেই মুহূর্তে দেশগত স্থিতি, তাহলে আমরা যে-কোনো মুহূর্তের (অতীতে হোক আর ভবিষ্যতে হোক) স্থিতি-কাঠামো নির্ণয় করে দিতে পারি। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে transformation— রূপান্তর। রূপান্তর না বলে আমরা বলতে পারি, মাপান্তর। এই মাপান্তর নানা ধরনের আছে— গতিবেগের সাম্য বা বৈষম্য অনুসারে। এই মাপান্তর বা মানান্তরের বিধি সমীকরণ সূত্রে (equation) বেঁধে দেওয়া হয়।

দেশকাল সম্বন্ধে এই যে সিদ্ধান্ত এটি হল প্রাচীনতর বা 'ক্লাসিকাল' বিজ্ঞানের কথা। এই সিদ্ধান্ত জগতের যে চিত্র এঁকেছে তাতে ত্রুটি, ফাঁক কোথাও আছে— এ প্রত্যয় বা অনুভবও আবার সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু ত্রুটি ঠিক কোথায় এবং মীমাংসাই বা কি তার যথাযথ হদিশ পাওয়া যায় নি। এই যেমন ত্রুটিটি গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno) দেখিয়েছেন তাঁর একিলিস (Achilles) আর কচ্ছপের বিখ্যাত গল্পে। গল্পটি এই : একিলিস ও কচ্ছপ পাল্লা দিয়ে দৌড় খেলছে। কচ্ছপ আগে, একিলিস একটু পিছনে— একিলিস, বলা বাহুল্য, কচ্ছপের চেয়ে অনেক বেশি জোরে ছুটছে। কিন্তু তা হলে কি হবে ? গাণিতিক হিসাবে সে কখনও কচ্ছপকে পেরিয়ে যেতে পারে না। কি রকম ? ধর, একিলিস ক বিন্দুতে, আর কচ্ছপ তার আগে খ বিন্দুতে ; একিলিস যখন এসেছে খ বিন্দুতে, কচ্ছপ তখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে গ বিন্দুতে, যতটুকু আগেই হোক। তার পর আবার একিলিস যখন এসে পৌঁছেছে গ বিন্দুতে, কচ্ছপ সেখানে নেই, এগিয়ে গেছে ঘ বিন্দুতে, যতটুকু আগেই হোক— এ রকমে কচ্ছপ সরে সরে যাবে বরাবর, একিলিস কখনও তার নাগাল পাবে না। তাহলে, শাস্ত্র অনুসারে একিলিস কচ্ছপকে কখনো ধরতে পারে না— শাস্ত্র অনুসারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ? শাস্ত্রের ফাঁক তবে কোথায় ?

অবশ্য গল্পটিকে এ যাবৎ গল্প হেঁয়ালি বা ধাঁধা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞান এর মধ্যে দেখছে নূতন অর্থ, নূতন অভিব্যঞ্জনা। ধাঁধাকে গম্ভীরভাবে নিয়ে তার একটা সদর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে। এ গল্পটি দেশ সম্বন্ধে যে প্রাচীন ও প্রচলিত ধারণা, তার মূলে যে অব্যবস্থা বা প্রমাদ রয়েছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ *(reductio ad absurdum)*। দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে স্বভাবত জিনিস দেখা হয়, তার পিছনে দুটি সিদ্ধান্ত বা স্বতঃসিদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। প্রথম হল, দেশ একটা বস্তুনিরপেক্ষ জিনিস অর্থাৎ বস্তু না থাকলেও দেশ থাকতে পারে, এবং এ-রকম শূন্য দেশের গুণবৃত্তি বিধি-বিধান নির্ণয় করা সম্ভব। জ্যামিতি, বিশেষতঃ ইউক্লিড-রচিত, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, দেশ হল বিন্দুসমষ্টি— অসংখ্য অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি বা ব্যষ্টিস্থানের সমাহার। একটা স্থির নির্বিকার একান্ত-বাহ্য স্বতন্ত্র প্রসার পড়ে রয়েছে, আর তার উপর পৃথক পৃথক ব্যষ্টিবিন্দু-সব চলাফেরা করছে— এই চিত্রটি সাধারণ চোখে দেখা যায় এবং বিজ্ঞান মূলত একেই স্বীকার করে নেয় ; কিন্তু সকল বিপত্তির মূলও ঠিক এইখানে। এ-রকম ব্যবস্থা অনুসারে একিলিস যে কচ্ছপকে ধরতে পারে না তা অনিবার্য। কারণ, গতি এখানে হয়ে পড়ে স্থিতির সমষ্টি মাত্র, স্থিতি পারম্পর্যই হয়ে ওঠে গতি। কিন্তু স্থিতির সমষ্টি স্থিতিই হতে পারে, গতি হয় না— অসংখ্য সংখ্যার সমষ্টি অসীম নয়, অথবা সান্তের অন্তহীন পরম্পরা বা পরিব্যাপ্তি অনন্ত নয়।

দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হল, কাল সম্বন্ধেও ঠিক তাই প্রযোজ্য। কাল মুহূর্তের সমষ্টি নয়, পারম্পর্য নয়। দেশ যেমন বরাবর সাজানো বিন্দুরাশি নয়, কালও তেমনি পরপর সাজানো নিমেষ-শ্রেণী নয়। দেশ যেমন একটা অখণ্ড অচ্ছেদ্য টানা প্রসার, কালও তেমনি একটা অবিভাজ্য একটানা প্রবাহ।

আইনস্টাইন তাই প্রাচীন চিত্রে একটা পরিবর্তন প্রস্তাব করলেন। বস্তু-নিরপেক্ষ একান্তবাহ্য স্বতন্ত্র দেশ যদি কিছু থাকে, তবে তা দিয়ে কাজ চলে না অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের কাজ ; আমাদের কারবার বস্তু-সাপেক্ষ দেশ নিয়ে। কার্যত বাস্তবে দেশ এক অখণ্ড কিছু নয়। দেশের এক-একটা গণ্ডী বা কোট রয়েছে— ফলতঃ প্রত্যেক বস্তু বা ব্যষ্টিরই রয়েছে নিজস্ব দেশ— প্রত্যেক বস্তু চলে তার চারিদিকে আপনার দেশকে সঙ্গে নিয়ে। কারণ বস্তুর দেশ-পরিমিতি নির্ভর করে তার গতির উপর। আর দেশ যে বস্তুনিরপেক্ষ নয়,

তার একটা হেতু কাল— প্রত্যেক বস্তুর পৃথক দেশ হতে বাধ্য, কারণ প্রত্যেক বস্তু রয়েছে পৃথক কালে। অন্য কথায়, প্রত্যেক বস্তু রয়েছে তার নিজস্ব দেশে ও কালে যুগপৎ অথবা দেশ ও কালের বিশিষ্ট যৌগপত্য নিয়ে হল বস্তুর বিশিষ্টতা।

স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ দেশ, স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ কাল আইনস্টাইন মানলেন না। তিনি দেশ ও কাল অভিন্নভাবে জুড়ে দিলেন, এনে দিলেন দেশ ও কালের সমবায় বা যৌগপত্য, আর দিলেন বস্তু (অথবা বস্তুগোষ্ঠী বা মণ্ডলী) অনুসারে এই দেশ-কাল-সমবায়ের বহুত্ব। অবশ্য এই বস্তুর বহুত্বের ঐক্যসাধন বা সমীকরণ করা চলে কিন্তু তা হল একটি গাণিতিক সূত্র মাত্র— গণনা বা অঙ্কক্রিয়ার জন্য তাতে সুবিধা হতে পারে, কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব তার কিছু নাই।

এই যে বৈজ্ঞানিক বা আইনস্টাইনীয় দৃষ্টিভঙ্গী— তার অনুরূপ দৃষ্টি বহুদিন হতেই এক শ্রেণীর দার্শনিককে প্রভাবান্বিত করে এসেছে। তাঁরা বলেছেন বাহ্যজগতের যে খবর সাক্ষাৎ মানুষের কাছে আসে তা হল অসংখ্য খণ্ডিত ব্যষ্টির পুঞ্জ— ইন্দ্রিয় তাদের এক এক করে নিয়ে আসে, পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু সে-সবকে সাজিয়ে গুছিয়ে রূপ দেয় মানুষের মনবুদ্ধি-চেতনা। যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বাহ্যজগতে আমরা দেখি তা বাহিরে আছে কি না জানা যায় না, তা হল ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের দান।

জর্মন দার্শনিক কাণ্ট সিদ্ধান্তটিকে এমন সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন যে তা একটা মহাবাক্যে পরিণত হয়েছে। তা হল এই যে, দেশ ও কাল মানুষের দুটি চোখ বা চোখের চশমা, এর ভিতর দিয়ে সে দেখে বিশ্বকে, এ ছাড়া বিশ্বকে সে দেখতে পারে না। দেশ ও কাল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত কিছু নয়, তা হল দ্রষ্টার মস্তিষ্কে দুটি ছাঁচ যার ভিতরে বাহিরের জগৎটা আকার গ্রহণ করে। জগৎ বা বস্তু নিজস্ব স্বরূপে কি তা জানবার উপায় নেই, জানবার যন্ত্র হল যা তার মূল গুণ হল দেশ ও কাল— মানুষ যা দেখে তা এ দুটির আয়তনে ছড়িয়ে পড়ে, সজ্জিত হয়ে দেখা দেয়। ভারতীয় মায়াবাদী বৈদান্তিকেরও অনেকটা ঐ মতই দাঁড়ায় শেষে— তিনি মায়াদৃষ্টিকে এক পা পিছনে সরিয়ে নিয়েছেন মাত্র। কাণ্ট মনবুদ্ধিকে রাজা করে দেশ-কালকে তার মুখ্য-মন্ত্রী বা দণ্ডবিধি করে সাজিয়েছেন— মায়াবাদী অহং বা অহং-প্রত্যয়গত ব্রহ্মকে সম্রাট করে চিৎশক্তিকে (দেশ ও কাল যার বাহ্য আয়ুধ বা ঐশ্বর্য) করেছেন সৃষ্টিপ্রসারের উৎস।

দার্শনিক তাহলে দেশ-কালকে মনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে তার ধর্ম, গুণ-কর্ম যা দিয়েছেন তাতে জড়েরই প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। এরকম হতে বাধ্য, কারণ, বৈদান্তিকেরা যেমন বলে থাকেন জগৎ বা দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন সত্তা হল 'ব্যাবহারিক' সত্য, আর সাংখ্যের মতে মন, সমস্ত প্রকৃতিই হল জড় বা অচিৎ— এক ব্রহ্ম বা পুরুষই, প্রকৃতির অতীতে বা বাহিরে যে সৎবস্তু তাই, চিন্ময়।

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন দেশ ও কালের যে প্রকৃতি দেখিয়েছেন তা যত নূতনই হোক জড়ের কাঠামোকে ছাড়িয়ে যায় নি। এমন কি তাঁর দেশ প্রাচীন জ্যামিতিক প্রসারের সমধর্মী মূলত, এবং কালও তদনুরূপ বিভাজ্য পরিমাণগত বস্তু। জড়ের মত উভয়কেই কাটা যায়, ছাঁটা যায়, মাপ করা যায়। আইনস্টাইন ওজনের বাটখারা শুধু বদলে দিয়েছেন কিন্তু ওজন রেখেছেন পুরোমাত্রায় প্রাচীনপন্থীর মতই। দেশ-কাল-সমবায় (Space-Time-Continuum) জড়প্রসার এবং জড়প্রসারের স্পন্দন, এই তো সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায়।

বের্গসন তাই বলেছেন যে জড়ের ধারা নিয়ে থাকলে চলবে না—জড় নিয়ে থাকলে গতির অর্থ হবে

একিলিস-কচ্ছপ-গতি অর্থাৎ আনর্থক্য। এই সত্যটি ভালো করে ধরতে হবে গতি অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গতি— পর পর সাজানো বিন্দু নয়, একটানা প্রবাহ। কাল এই সত্যের বিশেষ প্রতীক। কালকে মুহূর্ত-সমষ্টি হিসাবে আমরা দেখি, আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে। ঘণ্টা-মিনিট বাস্তবকালে কিছু নাই। বাস্তব-কাল টানা স্রোত— আসল সত্য হল এই নিরবচ্ছিন্নতা (*durée réelle*), কেটে কেটে যে দেখি' তা হল যেন মৃতদেহের বিশ্লেষণ— শবচ্ছেদ। ফলত স্থাবর জড় নয়, জীবনধারা, প্রাণপ্রবাহ জিনিসের নিগূঢ় রহস্য। প্রাণ ছুটে চলেছে তার নিজের আবেগে, স্বতোৎসারিত প্রেরণার অখণ্ড ধারাবাহিকতায় (*élan vital*) —এই প্রেরণার প্রবেগ যেখানে যতটুকু আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের কাঠামোয় বা কর্মপ্রযোজনের ছকে এসে বাঁধা পড়েছে তথনই সে হয়ে উঠেছে আমাদের পরিচিত বৈজ্ঞানিকের খণ্ডিত জড়ভূত জড়ধর্মী দেশকাল। প্রাণের দেশকাল জড়ের দেশকাল হিসাবের বাহিরে, তার সত্যকার স্বরূপ; জড় হল প্রাণের স্থির মৃত খণ্ড, প্রক্ষিপ্ত অবয়ব।

বের্গসন যে একটা নূতন পর্যায় এনে দিলেন দেশকালের, তা থেকে আমরা আরো কিছু এগিয়ে যেতে পারি। সৃষ্টির মধ্যে যে কেবল জড়ার প্রাণ আছে তা নয়— মন আছে, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) আছে, সত্তার ও চেতনার নানা স্তর আছে, প্রাচীন ঋষিরা বলে গেছেন। অধুনিক দ্রষ্টারা নীচের দিকে কয়েকটি আবিষ্কার করেছেন মাত্র, আরো নীচে আরো উপরে বহুতর স্তর আড়ালে রয়েছে অদৃশ্য আলো বা অশ্রুত ধ্বনির মত। এই প্রত্যেক স্তরের রয়েছে নিজস্ব প্রসার ও স্থায়িতা— অর্থাৎ দেশ ও কাল। আইনস্টাইন যে বলেছেন প্রত্যেক বস্তু বা ব্যষ্টিমণ্ডলীর রয়েছে পৃথক পৃথক দেশ ও কাল, সেকথা আরো গভীরতর ব্যাপকতর অর্থে সত্য। তিনি যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন তা হল জড় স্তরের পার্থক্য, আর তা পরিমাণগত; কিন্তু দেশ ও কালের গুণগত পার্থক্যও রয়েছে যখন ধরি চেতনার বিভিন্ন স্তর। জড়ের দেশকাল যেমন আছে, প্রাণের দেশ ও কাল আছে (বের্গসন যার কথা বলেছেন), মনের দেশকাল আছে (ভাববাদী দার্শনিকেরা যার কথা বলেন)— মনের উপরেও উঠে যেতে পারে, শুদ্ধবুদ্ধি ও সাক্ষাৎজ্ঞানের জগতে, দিব্য চেতনার জগতে, সচ্চিদানন্দের মধ্যে— দেশ ও কালের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়ে চলে তদনুসারে। অধ্যাত্ম-সিদ্ধেরা বলে থাকেন এমন চেতনা আছে যেখানে বিন্দু অর্থ অসীমতা, ক্ষণ অর্থ নিত্যতা— সান্ত ও অনন্ত অসীম ও সসীম যেখানে ওতঃপ্রোত হয়, প্রায় এক হয়ে আছে। জড় দেশ ও কালের প্রায় বিপরীত ধর্মই পেয়েছে এই লোকোত্তম দেশ ও কাল।

বৈদিক ঋষি বলছেন বাক চার শ্রেণীর— মানুষের মুখে প্রকট একটি মাত্র— সর্বশেষ শ্রেণীর। অবশিষ্ট তিনটি লোকোত্তর জিনিস, যবনিকার অন্তরালে আবৃত। দেশ ও কাল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে।

বঙ্গদেশে প্রভাকর-মীমাংসার চর্চা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মধ্যযুগে ভারতের সারস্বত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এক কথায় প্রকাশ করিতে গেলে মাত্র দুইটি শব্দ দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়— দার্শনিক সূক্ষ্মবিচার। ইহার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল বঙ্গদেশে। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া নব্যন্যায়ের চর্চা ৫০০ বৎসর (১৪০০-১৯০০ খ্রী) ধরিয়া প্রতিভার বিলাসকে এক দুরারোহ শিখরে উত্তোলিত করিয়াছিল। মিথিলার গুরুগৌরবের অবসান সূচিত করিয়া রঘুনাথ শিরোমণির সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যূন ৩৫০ বৎসর কাল ভারতবর্ষের সর্বত্র তর্কশাস্ত্রে বাঙালী জাতির পরম প্রামাণ্য ও প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্যযুগে শাস্ত্রচর্চায় এতটা একনিষ্ঠ সাফল্য অন্য কোনো প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার প্রামাণিক বিবরণ আমরা সবিস্তার সংকলন করিয়াছি।[১] নব্যন্যায়ের অভ্যুদয়ের ফলে বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি ও সম্প্রদায় প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া বাংলার সারস্বত ইতিহাসকে অনেকাংশে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে। পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা দ্বারা এই অন্ধকার দূর করা আবশ্যক। নতুবা বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতির গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য সম্যক্ চিত্রিত হইতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরিয়া বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চা পূতসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় প্রধানতঃ ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়াছে— কাব্যব্যাকরণাদি লঘুশাস্ত্র, নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়। একটি অতি বিস্ময়কর তথ্য আমরা অদ্য ভুলিতে বসিয়াছি যে, প্রাচীনকাল হইতে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসমাজ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণকে পাঠ্য করিয়া টীকাটিপ্পনী দ্বারা পরিবর্ধিত করিয়া লইয়াছে এবং ব্যাকরণশাস্ত্রে গৌড়ীয় গ্রন্থসংখ্যা সমগ্র ভারতের সমষ্টিসংখ্যার অন্যূন অর্ধাংশ হইবে। পাণিনি, কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, সারস্বত ও প্রযোগরত্নমালা অদ্যাপি বঙ্গদেশে নিবিড়ভাবে অধীত হয় এবং চান্দ্রব্যাকরণও এক সময়ে হইত। মৈত্রেয় রক্ষিত-প্রমুখ বাঙালীর পাণিনীয় গ্রন্থ (ধাতুপ্রদীপ প্রভৃতি) পূর্বে বাংলার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। এই বিপুল ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের যথাযথ বিবরণ সংকলিত হইলে বাঙালীর সারস্বত অবদানের ভিত্তি রচিত হইতে পারে।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দর্শনশাস্ত্রচর্চায় অধুনালুপ্ত বাঙালীর একটা অপূর্ব কীর্তির কথা নিদর্শনস্বরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রশ্ন হইল, নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের ও নব্যন্যায়চর্চার উৎপত্তির পূর্বে বাংলার সারস্বত কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ছিল এবং দর্শনশাস্ত্রের কোন্ বিভাগে বাঙালীর প্রতিভা উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। নব্যন্যায়ের চরম প্রতিষ্ঠাকালেও বাংলার চতুষ্পাঠীসমূহে দুইটি গ্রন্থ আলোচিত হইত : চিরঞ্জীবের বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী এবং কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।[২] শেষোক্ত গ্রন্থের দুইটি টীকাও বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছিল— মহেশ্বর ন্যায়ালংকার-কৃত (মুদ্রিত) ও রুদ্রদেব তর্কবাগীশ-কৃত (অমুদ্রিত)। নাটকটিতে রাঢ়দেশের ইতিহাস অন্তর্নিহিত আছে— অন্যতম পাত্র 'দক্ষিণ-রাঢ়'-নিবাসী অহংকার কাশীর পণ্ডিতদের মূর্খতা বর্ণনচ্ছলে 'সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা'মূলক ছয়জন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন

১ বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত, চৈত্র ১৩৫৮।

২ প্রবন্ধলেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহ স্মার্ত রামরাম সিদ্ধান্তবাগীশ (১১৫৭-১২৩৩ বঙ্গাব্দ) স্বহস্তে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুলিপি করিয়াছিলেন (৮০ পত্র, লিপিকাল পৌষ ১৭০১ শকাব্দ)।

— প্রথম পর্যায়ে গুরু, শালিক ও মহোদধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তুতাতিত্ত (=কুমারিল), বাচস্পতি ও মহাব্রত। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, কৃষ্ণমিশ্রের সময়ে (প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) দক্ষিণরাঢ়ই ছিল বাংলার সারস্বত কেন্দ্র এবং ষড়্‌দর্শনের মধ্যে পূর্ব-মীমাংসার সূক্ষ্মবিচারমূলক প্রস্থানদ্বয়— ভট্টমত ও গুরুমত— প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশে ন্যায়কন্দলীকার বৈশেষিকাচার্য শ্রীধর ভট্ট (৯১৩ শকাব্দ) হইতে নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌমের সময় পর্যন্ত সমগ্র ষড়্‌দর্শনের চর্চাই অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিচারের সূক্ষ্মতা দ্বারা প্রথমতঃ মীমাংসকাচার্য কুমারিলের সম্প্রদায় এবং পরে প্রভাকর গুরুর সম্প্রদায় চরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কন্দলীকার এবং সর্বজ্ঞকল্প গৌড়ীয় মহাপণ্ডিত ভবদেব ভট্ট কুমারিলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বৈদ্যকশাস্ত্রকার চক্রপাণিদত্ত নয়পালদেবের (১০৪০-৫৫ খ্রী) রাজত্বকালে গ্রন্থ রচনা করিয়া শেষে একটি বিস্ময়কর অভিসম্পাত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগান্ তত্রৈব নিঃক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথবেদবিদা জনেন দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥

'যে আমার গ্রন্থোক্ত অতিরিক্ত সিদ্ধযোগসমূহ বৃন্দরচিত সিদ্ধযোগগ্রন্থে নিঃক্ষেপ করে কিংবা আমার গ্রন্থ হইতে তুলিয়া দেয় তাহার মস্তকে ভট্টত্রয় ও বেদত্রয়াভিজ্ঞ মহাজনের প্রদত্ত অভিশাপ পতিত হউক'— টীকাকার শিবদাস সেন টীকা করিয়াছেন "কারিকা বৃহট্টীকা তন্ত্রটীকেতি ভট্টত্রয়ম্"। অর্থাৎ ঐ সময়ে সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ ছিলেন শ্রোত্রিয়, যিনি বেদত্রয়ের সহিত কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক, চিরলুপ্ত বৃহট্টীকা ও তন্ত্রবার্তিক অধিগত করিতেন।[৩]

কিন্তু কৃষ্ণমিশ্র ভঙ্গীক্রমে সূচনা করিয়াছেন কুমারিলের সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়া বঙ্গদেশে প্রভাকর গুরুর সম্প্রদায়ই অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রভাকর মিশ্র শবরভাষ্যের উপর দুইটি পৃথক্ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। একটির নাম 'বিবরণ', ক্ষুদ্র বলিয়া নামান্তর 'লঘ্বী', পরিমাণ ৬০০০ গ্রন্থ। ইহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অপরটির নাম 'নিবন্ধন', নামান্তর 'বৃহতী', পরিমাণ ১২০০০ গ্রন্থ। ইহার 'তর্কপাদ' সটীক মুদ্রিত হইয়াছে। ভোজরাজার 'শৃঙ্গারপ্রকাশে' (১১শ প্রকাশ) একটি শ্লোকে প্রভাকর সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ উক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে—

ধূর্তৈর্যৎ শ্বপচীকৃতো "বররুচিঃ" সর্বজ্ঞকল্পোপি সন্
জীবন্নেব পিশাচতাং চ গমিতো "ভর্চু"-র্যদভ্যর্চ্যধীঃ।
ছন্দোগোহয়মিতি "প্রভাকরগুরু"-র্দেশাচ্চ নির্বাসিতো
যদ্বৃত্তান্তবিজৃম্ভিতেন মহতা তৎসর্বমল্পীকৃতম্॥

নির্যাতনের প্রসিদ্ধ উদাহরণস্থল তিনজনের মধ্যে ভর্চু ছিলেন বাণভট্টের গুরু। প্রভাকর দক্ষিণ-কোশলের লোক ছিলেন, কারণ 'বঙ্গপ্রান্তে' পরীক্ষিত একটি বৃহতীর অনুলিপিতে পুষ্পিকা ছিল— 'ইতি শ্রীদক্ষিণ-কোশলেশ্বরমহামাত্যবিভাকরমিশ্রাত্মজস্য প্রভাকরমিশ্রস্য কৃতৌ বৃহত্যাং··।' (নয়বিবেক, মাদ্রাজ সং, প্রাস্তাবিক, পৃ. ৩৪)। 'ছন্দোগ' (অর্থাৎ সামবেদী অথবা বেদজ্ঞ) প্রভাকর কেন স্বদেশ হইতে নির্বাসিত

৩ শ্রীধরের বিবরণ ও কৃষ্ণমিশ্রের উক্তি 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে (পৃ. ৬-৮) দ্রষ্টব্য। চক্রপাণি দত্ত স্বয়ংই নয়পালের সভায় ছিলেন, তাঁহার পিতা নহে (I. H. Q., XXIII, 134-5)—এবিষয়ে সকলেই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

হইয়াছিলেন বুঝা গেল না। •প্রভাকর কুমারিল ভট্টের পরবর্তী, অথচ মণ্ডন মিশ্রের পূর্ববর্তী ছিলেন। মণ্ডনের 'বিধিবিবেক' গ্রন্থে প্রভাকরের উভয় গ্রন্থেরই বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (চৌখাম্বা সং, পৃ. ৯৬, ১০৯ ও ৪১৩) এবং একস্থলে (পৃ. ২৮১) 'অলং গুরুভির্বিবাদেন' বলিয়া প্রভাকরের প্রতি গুরুগৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবাবিষ্কৃত উম্বেক ভট্ট (অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ ভবভূতি) রচিত শ্লোকবার্তিকের তাৎপর্যটীকায় প্রভাকর সর্বত্র 'অনুপাসিতগুরু' পদে অভিহিত হইয়াছেন (পৃ. ১৪,৩০,৩৩ প্রভৃতি)। এই পদের উৎপত্তি-সূচক আখ্যায়িকা বর্তমানে জানিবার উপায় নাই— সম্ভবতঃ স্বীয় গুরু কুমারিল ভট্টের সহিত উৎকট মতবিরোধজনিত এই বিদ্রূপাত্মক পদ হইতেই তাঁহার 'গুরু'-নাম রূঢ়িপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভট্টমত ও গুরুমতের নানা বিষয়ে পার্থক্য এখন প্রকরণপঞ্চিকা, প্রভাকরবিজয়, মানরত্নাবলী প্রভৃতি মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। মীমাংসাদর্শনের মূল 'অধিকরণ'বিভাগে ভট্টমতে ও গুরুমতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই— অধিকরণ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বিচারের) সংখ্যা এক সহস্র, যদিও মাধবাচার্যের 'ন্যায়মালাবিস্তারে' ৯০৭ অধিকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াই ভট্ট ও প্রভাকরের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং কোনো কোনো 'গুরুমত' এখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে চিরস্থায়ী বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা দুইটিমাত্র মত নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। বাক্যার্থ বিষয়ে কুমারিলের সম্প্রদায় 'অভিহিতান্বয়বাদী' অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি দ্বারা এই মতে বাক্যগত পদসমূহের পদার্থমাত্রই প্রতীত হয় এবং তাৎপর্য নামক পৃথক্ বৃত্তি দ্বারা অন্বয়াংশ পরে প্রতীত হইলে বাক্যার্থের উপলব্ধি হয়। প্রভাকর হইলেন 'অন্বিতাভিধানবাদী' অর্থাৎ অন্বয়াংশও অভিধাবৃত্তিলভ্য বটে। কাব্যপ্রকাশের বাঙালী টীকাকার পরমানন্দ ভট্টাচার্যচক্রবর্তী "বাচ্য এব বাক্যার্থঃ" পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন— "অভিধয়ৈবান্বয়-বোধোপপত্তৌ কিং বৃত্ত্যন্তরেণেতি অন্বিতমেবাভিধত্তে ইতি বাদিনঃ প্রভাকরগুরোর্মতমিত্যর্থঃ'। এস্থলে উভয় মতের পরিষ্কার প্রণালী কালক্রমে অতি সূক্ষ্মস্তরে উঠিয়াছিল।

'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে পূর্বপক্ষকারীর আপত্তি, অন্যপর ও অবিবক্ষিতার্থ বলিয়া 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই বিধিবাকের 'ভাব্য' অর্থাৎ ফল বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না এবং শাস্ত্রারম্ভের সার্থকতাই নাই। কুমারিলের মতে ঐ বিধিবাক্য দ্বারাই বেদাধ্যয়ন বিহিত হয়—'স্বাধ্যায়'-পদ বৃত্তিকার উপবর্ষাদির ব্যাখ্যাবলে 'প্রাপ্য'-কর্ম রূপে গ্রহণীয় (নির্বর্ত্য ও বিকার্য কর্ম নহে)— এইভাবে শাস্ত্রারম্ভও সার্থক হয়। প্রভাকর এস্থলে সূক্ষ্মবিচারের অবতারণা করিয়া বলেন, স্বর্গাদি ভাব্য (অথবা ফল) নিশ্চয়ই বেদাধ্যয়নরূপ কার্যের প্রয়োজক নহে— যাগাদি বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যে 'অপূর্ব'-নামক অতীন্দ্রিয়বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই প্রয়োজক। অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির লোভে যাগাদি কর্তব্য নহে, বেদোক্ত বিধিবাক্যদ্বারা বিহিত বলিয়াই তাহা কর্তব্য। যাগানুষ্ঠান একজন কর্তা বিনা হয় না এবং 'অধিকার' বিনা কর্তৃত্বও ঘটে না। 'এই কার্যে আমিই প্রভু'— এবম্বিধ প্রভুত্ববোধই অধিকার পদের অর্থ ('অস্মিন্ কর্মণ্যহমীশ্বর ইত্যেবমৈশ্বর্যলক্ষণোঽধিকারঃ'— ন্যায়সিদ্ধি পৃ. ৮)। পক্ষান্তরে 'নিযোজ্য' বিনা অধিকার-সিদ্ধি হয় না— 'ইহা আমার কর্তব্য' এইরূপ জ্ঞানশালী ব্যক্তি নিযোজ্য ('মমেদং কর্তব্যমিতি বোদ্ধা নিযোজ্যঃ', ঐ)। স্বর্গ-পুত্রাদি কামনা নিযোজ্যের বিশেষণরূপেই গ্রাহ্য। সুতরাং ৮ বৎসরের মাণবকের বিষয়ে বেদাধ্যয়নে অধিকারের প্রশ্নই উঠে না—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' বিধিবাক্য তাহার বোধগম্য নহে। প্রভাকরের মতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন 'আচার্যকরণ' বিধিদ্বারা প্রযুক্ত এবং এই বিধির অনুমাপক হইল মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ শ্লোক—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্-দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥ ২।১৪০

এস্থলে স্মৃত্যনুমিত বিধিবাক্য হইবে 'শিষ্যমুপনীয় বেদাধ্যাপনেনাচার্য্যকং ভাবয়েৎ'। নব্য-প্রাভাকরের মতে, 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত' ইহাই আচার্যকরণবিধি। এই বিধির প্রয়োগ দ্বারা মাণবকের বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান হইতে ক্রমে অধিকারবোধ ঘটে। প্রাচীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে প্রভাকরের অভিনব যুক্তি বর্তমান প্রগতির যুগেও আলোচনা যোগ্য। প্রভাকরের মতে যাহা বেদবাক্য তাহাই কর্তব্য, কুমারিলের মতে ফলবৎকর্মাববোধ বিনা কর্তব্যতা বুদ্ধি জন্মে না। সুতরাং প্রভাকরমত ছাত্রদের বশ্যতাবুদ্ধির (discipline) পরিপোষক এবং ভট্টমত তাহার বিরোধী বলা যাইতে পারে।

প্রভাকরমতের দুইজন ভারতবিশ্রুত মহাপণ্ডিত ও গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শালিকনাথ গুরুমতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম টীকাকার— তিনি বৃহতীর উপর 'ঋজুবিমলা', লঘ্বীর উপর 'দীপশিখা' এবং 'প্রকরণপঞ্জিকা' ও 'ভাষ্যপরিশিষ্ট' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় ও ঋজুবিমলার তর্কপাদ মুদ্রিত হইয়াছে এবং দীপশিখার শেষাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালাবার অঞ্চলে একটি চমৎকার শ্লিষ্ট শ্লোক প্রচারিত আছে—

শালিকনাথবদ্-মূঢ়ো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
প্রভাকরপ্রকাশায় যেন দীপশিখা কৃতা॥

শালিকনাথ স্বয়ং তাঁহার টীকাদ্বয়কে 'পঞ্চিকা'-পদে উল্লেখ করিয়াছে ('পঞ্চিকাদ্বয়ে প্রপঞ্চিতম্'— প্রকরণ-পঞ্জিকা পৃ. ৪৬) এবং পঞ্চিকাকার পদে মীমাংসকেরা একমাত্র শালিকনাথকেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহার কালনির্ণয় করা কঠিন— প্রভাকরের সাক্ষাৎ শিষ্য হইলে (প্রকরণপঞ্জিকার ২য় প্রকরণের আরম্ভে 'প্রভাকরগুরোঃ শিষ্যৈস্তথা যত্নো বিধীয়তে' তাহাই সূচনা করে) তাঁহার অভ্যুদয়কাল হয় প্রায় ৭৫০-৮০০ খ্রী.। উদয়নাচার্য (খ্রী. ১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ) অনেক স্থলে তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিরণাবলীর তেজঃ প্রকরণে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে ('কেচিত্তু সংসর্গিদ্রব্যতয়া নিঃসরদেব নায়নং তেজঃ··ইতি সমাধানমাহুঃ'— সোসাইটি সং পৃ. ২৮৮)— বর্ধমানের মতে তাহা 'শালিকমত' বটে। কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকে উদয়নের একটি অদ্ভুত বিদ্রূপোক্তি ('ভবতি হি বেদানুকারেণ পঠ্যমানেষু মন্বাদিবাক্যেষু অপৌরুষেয়ত্বাভিমানিনো গৌড়মীমাংসকস্যার্থনিশ্চয়ঃ') ব্যাখ্যা করিয়া কাশ্মীরনিবাসী বরদরাজ লিখিয়াছেন— 'গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকারঃ, গৌড়ো হি বেদাধ্যয়নাভাবাদবেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসক ইত্যুক্তম্' (কুসুমাঞ্জলিবোধিনী, পৃ. ১২৩)। মন্বাদি স্মৃতি বাক্যের শ্রুতিভিন্নত্ব শালিকনাথ জানিতেন না, ইহা অসম্ভব উক্তি এবং প্রতিপক্ষভূত প্রতিবেশী বিদ্বৎসমাজের প্রতি যুক্তিহীন আক্রমণ মাত্র বলিয়া মনে হয়।

প্রভাকরমতের দ্বিতীয় গ্রন্থকারের নাম মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র— মণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় শব্দখণ্ডে তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া 'শব্দমণি-পরীক্ষা' নামক এক অতি দুর্লভ টীকাগ্রন্থে আমরা উক্তি দেখিয়াছি ('অয়ঞ্চ সিদ্ধান্তবিরোধঃ প্রভাকরং প্রতি ন তু মিশ্রং তেনাশ্বানামেবাত্র দেবতাত্বাস্বীকারাৎ, তন্মতস্তু বক্ষ্যমাণচন্দ্ররাদ্ধান্তদূষণেনৈব দূষিতমিত্যুপেক্ষিতম্।' কাশীর সরস্বতী ভবনের পুথি ১১৮ পত্র)

শঙ্কর মিশ্রের বাদিবিনোদ, পদ্মনাভের সেতুটীকা (পৃ. ১০৫) প্রভৃতি গ্রন্থে 'প্রাভাকরৈকদেশী' একাদশ পদার্থবাদী চন্দ্রের মতোল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদ্রচিত দুইটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে 'অমৃতবিন্দু' প্রকরণ (সোসাইটির অতি অশুদ্ধ পুথি, পত্রসংখ্যা ৪৯) ও 'নয়রত্নাকর'।[৪] অমৃতবিন্দুতে অপূর্ববাদ ও বিধিবাদের সূক্ষ্ম বিচার আছে— নিবন্ধন (৩৬।২, ৪৮।১-২ পত্র), বিবরণ (২৩।১, ৩৬।২ ও ৪৮।২ পত্র) ও প্রকরণ-পঞ্জিকা (৩৪।১ পত্র) ব্যতীত এক স্থলে মহাব্রতের (৪৫।১ পত্র) নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। নয়রত্নাকরের শেষে তিনি কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অসৌ চন্দ্রঃ শ্রীমানকৃত নয়রত্নাকরমিমং
নিবন্ধং 'পোশালী' কুলকমলকেদারমিহিরঃ।

মিথিলার ব্রাহ্মণসমাজে পোশালীকুল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণসমাজে কাশ্যপগোত্র শ্রোত্রিয় 'পুশিলাল' বংশ সুপরিচিত। আমরা প্রাচীন কুলপঞ্জী হইতে এই বংশের উল্লেখ যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি— 'শৌরিঃ পোষলিরেব চ' (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী, নবদ্বীপের পুথি), 'ভানুঃ পোষলিরেব চ' এবং 'তিলাড়ী পোষলী নান্দী পলশাঞ্জিস্তথৈব চ' (অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথি)। সুতরাং রাঢ়দেশে অবস্থিত পোশলীগ্রাম হইতে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে এবং জীমূতবাহন ও ভবদেবের ন্যায় চন্দ্রও রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ছিলেন। আমরা নয়রত্নাকর গ্রন্থ অদ্যাপি পরীক্ষা করিতে পারি নাই। এই গ্রন্থে পঞ্জিকা ও বিবরণ ব্যতীত 'বিবেক' (অর্থাৎ ভবনাথ-রচিত নয়বিবেক) ও শ্রীকরের নামোল্লেখ আছে।[৫] সুতরাং চন্দ্রের অভ্যুদয়কাল খ্রী. দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন নয় বিবেককার ভবনাথও বাঙালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়— প্রবোধচন্দ্রিকার অভিজ্ঞ টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপ 'ভবনাথবৎ' ও 'ভবদেববৎ' পদদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে যেভাবে যোজনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐরূপ অনুমানের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কৃষ্ণমিশ্রের সময় হইতে রাঢ়দেশে প্রভাকরমীমাংসার চর্চা ক্রমবর্ধমান গতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করে। উৎকলনিবাসী সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের পিতামহানুজ কবিপণ্ডিত চণ্ডিদাস কাব্যপ্রকাশের 'দীপিকা' টীকা রচনা করেন (খ্রী. ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)। পঞ্চমোল্লাসের টীকা হইতে চণ্ডিদাসের একটি কৌতুকজনক সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল—

'ন চ সামান্যয়োঃ পরস্পরমন্বয়ঃ সম্ভবতি, ব্যক্তিদ্বারকান্বয়স্তু ব্যক্তীনামসামান্যতয়ানভিধেয়ত্বেন নিরস্ত ইতি চেৎ কিং পুনরতঃ। প্রাভাকরীয়ান্বিতাভিধানদৌর্বল্যাদিতি চেৎ কিমস্মাকমনয়া পরগৃহচিন্তয়া। যথা তথা প্রাচীনতন্ত্রাপূর্ববৃত্তিবোধ্যো বাক্যার্থ ইত্যেতাবানেব হি ধ্বনিতন্ত্রসারঃ। যদি তু প্রাভাকরৈঃ সার্ধং বিজিগীষুকথাকণ্ঠদুর্দুরো দেহস্তদা তামেব মৃগয়িতুং রাঢ়াদিরাষ্ট্রং গচ্ছেতি ব্যঙ্গ্য এব সর্বো বাক্যানামর্থ ইতি নির্বিবাদমতঃ।'[৬]

শঙ্খধর রণরঙ্গমল্ল মহামণ্ডলিকাধিরাজ গোবিন্দদেবের সভায় 'লটকমেলক' প্রহসন রচনা করেন— সাহিত্যদর্পণে (৩।২১৯) একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক ('গুরোর্গিরঃ পঞ্চদিনান্যপাস্য' ইত্যাদি) এই লটকমেলক হইতে (২।১৫) উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরবর্তী শ্লোকটি এই—

---

৪ Sastri : *Nepal Cat*, 1905, p. 113

৫ Jha Comm. Vol, p. 245

৬ সোসাইটির অতিজীর্ণ তালপত্র পুথি, ৪ পত্র।

তথা হি রাঢ়ীয়া বচনরচনা,

এষ ব্যাকরণং ন বেত্তি ন কৃতঃ কাব্যেষ্বনেন শ্রমঃ
শ্রুত্বাচামতি ভট্টবার্তিকগিরঃ স্নাতি স্পৃশংস্তদ্বিদঃ।
চাণ্ডালানিব তর্কশাসনপটূন্ নৈয়ায়িকান্ মন্যতে
রাঢ়ীয়ৈরতিহর্ষগদ্গদগলৈঃ প্রাভাকরঃ শ্রূয়তে ॥[৭]

পরবর্তীকালে নব্যন্যায়ের অপূর্ব আকর্ষণের সহিত ইহার তুলনা হয়।

প্রভাকরমতাবলম্বী বহু বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। শূলপাণির পূর্ববর্তী বিখ্যাত গৌড়ীয় স্মৃতিনিবন্ধকার নারায়ণোপাধ্যায় স্বয়ং ছিলেন "প্রভাকরমতস্থিতিলব্ধকীর্তিঃ" এবং তাঁহার পিতা গোন ও পিতামহ উমাপতিও প্রাভাকর ছিলেন। উত্তর রাঢ়ের এই বিশিষ্ট পণ্ডিতগোষ্ঠীর বিবরণ আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি।[৮] চক্রপাণি দত্তের প্রাচীন টীকাকার রামপালের অধীন বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর একস্থলে ছুরাধিকরণন্যায়ের আলোচনা দ্বারা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিয়াছেন এবং অজ্ঞাতপূর্ব 'বররুচি' নামক প্রাভাকর আচার্যের একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'অত্রার্থে বররুচিঃ—

প্রাচীনং যত্তু যজ্ঞস্য তেনোপাংশ্বিতি চান্বয়ঃ।
বীপ্সা-তেনেতি শব্দাভ্যাং ব্যবধান্ন তথান্বয়ঃ ॥'

ব্যাখ্যা শেষে আছে 'ছুরাধিকরণন্যায়ঃ প্রাভাকরাণাম্'।[৯] ৩৫ বৎসর পূর্বে রাজসাহীতে পূর্বনৈষধের একটি সুপ্রাচীন টীকা আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার শ্রীবৎসেশ্বর (সংক্ষেপে শ্রীবৎস) পিতৃপরিচয় দিয়াছেন 'মীমাংসাহৃদয়াধিদৈবতমভূদ্ যঃ শ্রীনৃসিংহঃ কৃতী' (নবম সর্গের শেষে) এবং 'গুরুনয়বিদাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সভাসু বিপশ্চিতাম্' (অষ্টম সর্গের শেষে)। সুতরাং ইহাও একটি প্রাভাকর গোষ্ঠী এবং সম্ভবতঃ বাঙালী। মীমাংসাদর্শনের এবং বিশেষ করিয়া প্রভাকরমতের চর্চা বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রায় ১৪০০ খ্রী. বিলুপ্ত হইতে থাকে— ইহার কারণ দুইটি, গঙ্গেশের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা এবং তন্ত্রমতের প্রাবল্যহেতু বেদচর্চা ও আনুষঙ্গিক মীমাংসাদর্শনের প্রচারসংকোচ। গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রধানতঃ গুরুমতেরই খণ্ডন।

---

৭ কাব্যবালা সং, পৃ. ২২

৮ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৬-১৭।

৯ রত্নপ্রভা, পুণার পুথি, ১৫৩ পত্র, Indian Historical Quarterly, XXIII, p. 147

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস বৈষ্ণবপদাবলীর যুগ্ম কবি। কিন্তু কবিপ্রতিভার স্বরূপবিচারে উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য কিছু কম নয়। চণ্ডীদাসকে বলা যায় খাঁটি গীতিকবি, আর বিদ্যাপতির গীতিপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় কলাকৌশলবোধ। এই নাট্যধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্যাপতির পদাবলীকে একখানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করিয়াছিলেন— বিদ্যাপতির রাধিকা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে—সেখানেই বিদ্যাপতির নাট্যশিল্পপ্রবণতার প্রতি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আত্মনিষ্ঠতা এবং একই ভাবকে নানাভঙ্গীতে নানা আবেশে আস্বাদন যদি গীতিকবির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়, চণ্ডীদাসকে তাহা হইলে খাঁটি গীতিকবি বলা যায়। আর বস্তুনিষ্ঠতা ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ বা বিবর্তনই যদি নাট্যকলাকৌশলের মূল কথা হয়, বিদ্যাপতির পদাবলীকে তাহা হইলে গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। আত্মনিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সাহিত্যের দুইটি ভঙ্গী। আত্মনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়কে আচ্ছন্ন করিয়া প্রধান হইয়া ওঠে বিষয়ী; বস্তুনিষ্ঠ কবিতায় বিষয়ী গৌণ, বিষয়ই মুখ্য। প্রথমটির সার্থক উদাহরণ গীতিকবিতা, দ্বিতীয়টির সার্থক নিদর্শন নাটক বা মহাকাব্য। চণ্ডীদাসের আত্মনিষ্ঠতা এবং বিদ্যাপতির বস্তুনিষ্ঠতা, চণ্ডীদাসের গীতিপ্রবণতা এবং বিদ্যাপতির নাট্যকলা-কৌশলবোধের চূড়ান্ত নিদর্শন রহিয়াছে উভয়ের রাধিকাচরিত্র-পরিকল্পনায়।

কবি চণ্ডীদাস নিজে এবং চণ্ডীদাসের রাধিকা মূলতঃ অভিন্ন। স্রষ্টা আর সৃষ্টি সেখানে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর চণ্ডীদাসের কৃষ্ণসেবাবাসনার ব্যাকুল আবেগ রাধিকার মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকা তাই কবিরই মানস-প্রতিফলন। এ রাধিকা বৈষ্ণবী প্রেমের symbol; তিনি বৈষ্ণবদর্শনের মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। ইনি অশরীরী ভাববিগ্রহ বলিয়া ইঁহার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন বা বিবর্তন নাই। চণ্ডীদাস অবশ্য ইঁহাকে নানা অবস্থায় কল্পনা করিয়া নানা ভঙ্গীতে ইঁহার লীলা আস্বাদন করিয়াছেন। তবু পূর্বরাগের রাধিকা, মিলনের রাধিকা আর বিরহের রাধিকা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। ইঁহার অবস্থা-পরিবর্তন জলের আধার-পরিবর্তনের অনুরূপ। আমরা আদিতে তাঁহাকে যেভাবে দেখি পরিণতিতেও তাঁহাকে ঠিক সেইভাবে দেখি। তাঁহার পূর্বরাগ উচ্ছ্বাসহীন, মিলনও উল্লাসহীন। তাঁহার পূর্বরাগ-মিলন-অভিসারের উপর বিরহের কালোছায়া প্রসারিত হইয়া তাঁহাকে পরম বিষাদময়ী করিয়া তুলিয়াছে। তিনি চিরবিরহিণী-বিষাদপ্রতিমা। তাই প্রথম পূর্বরাগের সময় দেখি—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্বেই রাধিকার যে ক্রন্দন শুরু হইয়াছে বিরহ পর্যন্ত সেই ক্রন্দনের জের চলিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রাধিকার কেন্দ্রস্থ ভাবটি এই— যাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাই মানসসাগরের অগমতীরে তাঁহার বাস, তাঁহার সহিত মিলিত হইব কেমন করিয়া? তাই রাধিকা 'সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নতারা'। এ প্রেমে যে আর্তি তাহা তো মিলনেও মিটিবে না, উভয়ের মধ্যে যে চিরবিরহের অশ্রুলবণাম্বুরাশি উদ্বেল, ক্ষণিক মিলন তাহার উপর সেতু রচনা করিবে কেমন করিয়া? তাই 'দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'। চণ্ডীদাসের রাধিকা এই ভাবেরই বিগ্রহ।

বিদ্যাপতির রাধিকা কোনো বিশেষ ভাবের বিগ্রহ নন। তাঁহার চরিত্র আছে। তিনি রূপৈশ্বর্যে মূর্তিমতী। তিনি কবির মানস-প্রতিফলন নন, কবি তাঁহাকে দূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকার শুধু পরিণতিটুকুই আছে। বিদ্যাপতির রাধিকার সূচনাও আছে পরিণতিও আছে, এবং সূচনা হইতে পরিণতি পর্যন্ত সেই চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানা স্তর আছে। এইখানেই বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তাঁহার নাটকীয় কলাকৌশলবোধের পরিচয়। পরিণতিতে বিদ্যাপতির রাধিকাও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, নানা মান-অভিমান-মিলন-বিরহের পালা, নানা অশ্রুহাসির দোলা। বয়ঃসন্ধিতে যে রাধিকা 'মেঘমালা সঁয় তড়িত লতাজনি', যাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'গেল চলি কামিনী গজহুগামিনী', সেই বিদ্যুল্লেখাসম চঞ্চলসৌন্দর্যপ্রতিমাকে পরিশেষে দেখিলাম 'মলিন কুসুম তনু চীরে, করতল কমল ঢর নীরে'। বিদ্যাপতি কুশল-নাট্যকারের মত তাঁহার রাধিকাকে ক্রমশ এই পরিণতির পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ক্রমশ বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছেন। তাই রাধিকার বাহিরের রূপপরিবর্তনের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন আসিয়াছে। বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত বিদ্যাপতির রাধিকা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার মানস-বিকাশের সূক্ষ্ম স্তরগুলি স্পষ্ট ধরা পড়িবে। এ দিক দিয়া বিদ্যাপতির রাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরহ-খণ্ডে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার অশ্রুপ্লাবনে 'কালিনী নই' কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল দান-খণ্ড বান-খণ্ডের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা এবং বিদ্যাপতির রাধিকার যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের রাধিকার সেখানে শুরু।

বর্তমান আলোচনায় বিদ্যাপতির নায়িকার মানস-বিকাশের ধারাটি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধি হইতে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ের পদ এই আলোচনার বিষয়ীভূত করা সম্ভব হইবে না; তাহা হইলে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতির অভিসার এবং বিরহ -পর্যায়ের পদগুলির বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনা প্রসঙ্গে রাধিকার মানস-পরিবর্তনের স্তরগুলির প্রতি ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করা হইবে। আশা করা যায়, ইহাতেই বিদ্যাপতির নাট্যপ্রতিভার আভাস পাওয়া যাইবে।

২

অভিসারের পরিকল্পনায় বিদ্যাপতির মৌলিকত্ব না থাকিলেও অভিনবত্ব আছে যথেষ্ট। ভাগবতপ্রমুখ পুরাণ-রচয়িতারা সাংকেতিকতার তির্যক পথ অবলম্বন না করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ঐশী মহিমা অত্যন্ত সরল প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেবই সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে পূর্ণ মানবিকতার

স্ফুরণ করাইয়া মানবীয় প্রেমের পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন স্তর-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'এ প্রেমেও আর্তি আছে, ঘাতপ্রতিঘাত আছে, মান-অভিমান-মিলন-বিরহের পালা আছে। ভাগবতকার রাধাকৃষ্ণের যে লীলাকে কেবলমাত্র শুষ্ক ধর্মাবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন জয়দেব তাহাকে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংঘাতসংকুল মানবমনের সনাতন হৃদয়বৃত্তির সহিত সংযোগ ঘটাইয়া ইহাকে ভক্ত ও রসিকের হৃদয়তীর্থে স্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার অভিসারযাত্রার বিবরণ অনুসরণ করিয়া তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমে সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা আরোপ করিয়াছেন, কৃষ্ণের যে সর্ববিলোপী আকর্ষণ এবং রাধিকার যে নিবিড় প্রেমাবেশ এই পর্যয়ের পদগুলির মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে তাহা পরবর্তী সমস্ত বৈষ্ণবপদকর্তাদিগের আদর্শ। কিন্তু জয়দেবের কাব্যেও অভিসারের অধ্যাত্মব্যঞ্জনাটি অতিপল্লবিত সৌন্দর্যবর্ণনার এবং সুললিত শব্দঝংকারের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। অভিসারের মধ্যে প্রেমের যে চিত্র ফুটিয়া ওঠে তাহাতে স্নিগ্ধ ভাববিহ্বলতা নাই, আছে অপ্রতিরোধনীয় উত্তেজনা এবং গতি। অভিসারের বর্ণনার ভিতর দিয়া সেই গতি প্রেমিক-প্রেমিকার সেই অসীম দুঃসাহসিকতার আভাস ফুটিয়া ওঠা চাই। পরিবেশ-বর্ণনার ভিতর দিয়া এই মূল সুরটি স্ফুটতর হইবে, নতুবা প্রতিবেশ-সৌন্দর্যের মধ্যে যদি কেবল ঘুমপাড়ানি স্নিগ্ধতাই প্রধান হয়, অভিসারের মূল উদ্দেশ্য তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে না। সে বিচারে জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব বেশি।

বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের পদগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং এই বিভিন্ন শ্রেণীর পদগুলির ভিতর দিয়া নায়িকার মানস-পরিবর্তনের কতকগুলি স্তরও আবিষ্কার করা যায়।—

১॥ কতকগুলি পদে আছে অভিসারের পূর্ব-প্রস্তুতির বর্ণনা। পদসংখ্যা ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩ প্রভৃতি।[১] এই শ্রেণীর পদগুলিতে অভিসারে যাইবার জন্য রাধিকার সুচতুর সখীবৃন্দ রাধাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন অভিসারের প্রকৃষ্ট সময় কখন, অভিসারের জন্য কখন কি পরিচ্ছদ-ভূষণ পরিধান করিতে হয়, কিভাবে অঙ্গসজ্জা অলংকরণ করিতে হয়, কিভাবে নূপুর ও মেখলার মুখরতা রোধ করিতে হয়,— এইরূপ নানা বিষয়ের উপদেশ দিয়া রাধিকাকে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

এই পদগুলিতে রাধিকার প্রতি সখীবৃন্দের উক্তি দ্বারা অনুমান করা যায় যে, রাধিকা তখন অভিসারে যাইবার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। গুরুপরিজনের ভয় তখনও তাঁহার হৃদয় কম্পিত করিতেছে। অভিসারোপযোগী অঙ্গসজ্জাতেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা এবং এই বর্ষা-রজনীতে প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়া নায়কের সঙ্গে মিলিত হইতেও তিনি অনিচ্ছুক। মিলনের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল নয় যে লোকলজ্জা এবং পথভীতি দূর করিতে পারে। অভিসার-যাত্রার অনিচ্ছা প্রকাশ্যে কোথাও ব্যক্ত না হইলেও সখীদের পুনঃপুনঃ অনুরোধেই ইহা অনুমান করা যায়। আবার কৃষ্ণের আকর্ষণ তাঁহাকে স্থির থাকিতেও দিতেছে না, 'জীব সয়ঁ তৌলল গরুঅ সিনেহ'— প্রাণের চেয়ে স্নেহ তাঁহার কাছে বড় মনে হইল, তাই 'বাটভুয়ঙ্গম উপর পানি' উপেক্ষা করিয়া তিনি অভিসারে চলিলেন, কিন্তু 'চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই গুরুজন ভবন দুয়ার'; শুধু তাই নয় 'অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই, কাঁপই নীল নিচোল'।

---

১ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'

এগুলিকে ঠিক অভিসারের পদ বলা যায় না, অভিসারের মূল অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাটি দুর্জয় প্রেমের আবেগ এবং রাধিকার অসাধারণ কৃচ্ছ্র সাধনার ব্যঞ্জনা এ শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে কোথাও ফুটিয়া ওঠে নাই। অভিসারিকা রাধিকার যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত এ পদগুলির মধ্যে রাধিকার সে রূপের প্রকাশ কোথায়? এ রাধিকা লজ্জানম্র, ব্রীড়াসংকুচিত, কিন্তু অভিসারিকা রাধিকা অসমসাহসিকা, প্রচণ্ড আবেগে উল্কাগতিতে পথের সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ছুটিয়া যান নায়কের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায়। মূল ভাবব্যঞ্জনার সহিত নিঃসম্পর্কিত হইলেও পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে আলোচ্য পদগুলি অভিসারের অপরিহার্য অঙ্গ।

২॥ আর-এক শ্রেণীর পদ আছে সেগুলির মধ্যে রাধিকার দ্বন্দ্বমথিত চিত্তখানি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। পদসংখ্যা ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭২ ইত্যাদি। একদিকে কৃষ্ণের প্রেম, আর-একদিকে কুলগৌরব। কৃষ্ণের প্রেম— অমোঘ তাহার আকর্ষণ, সে আকর্ষণকেও উপেক্ষা করা যায় না। আবার পতিব্রতাধর্ম, লৌকিক সংস্কার, লোকলজ্জা, নিন্দা-ভর্ৎসনার ভীতি তাহাও-বা বিসর্জন দেওয়া যায় কি করিয়া। অবশেষে সর্ববিধ্বংসী প্রেমই জয়ী হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বক্লিষ্ট রাধিকার আন্তর-চিত্রখানি কবি অত্যন্ত কৌশলের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন—

> কহই ন পারিঅ সহন ন জায়।
> বচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
> কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
> কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ॥

এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে কৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ, ইহার ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের প্রগাঢ়তা বিশেষভাবে দ্যোতিত হইয়াছে—

> ও ভরে লাগল নব সিনেহা
> এঁ ভরে কুলকগারি।
> সকল পেম সম্ভারি না হোএত
> হঠ বিনাসতি নারি॥

এই শ্রেণীর পদ সংখ্যায় কিছু কম নয়। এগুলিকে যথার্থ অভিসারের পদ বলা যায়। অভিসারে পথের দুঃসাহসিক বর্ণনাটাই মুখ্য নয়— রাধিকার অন্তর্জগতের যে বিলোড়ন, পশ্চাতের বন্ধন এবং সম্মুখের আকর্ষণ, এই সমাধানহীন সমস্যার পীড়নে রাধিকার যে করুণ আর্তি তাহাও মূল অভিসারের পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অভিসার-পর্যায়ের অন্য পদগুলি যদি বাহ্যিক অভিসারের পদ বলিয়া নামকরণ করি, এগুলিকে তাহা হইলে বলা যায় মানস-অভিসারের পদ। এই মানস-অভিসারের বর্ণনা এক অদ্ভুত তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদে। সে পদটি এই— 'সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার হরি রহু মানস সুরধুনী পার'। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে রাধিকার অভিসারের কথা বলা হইলেও ইঙ্গিতটি মহাপ্রভুর স্বরূপ অভিসারের দিকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং একটি তত্ত্ব। তাঁহার নিজের মধ্যেই কৃষ্ণ ও রাধার লীলা চলিতেছে—সেই লীলার যে আস্বাদন মহাপ্রভুর তাহাই স্বরূপাস্বাদন। পূর্বে রাধা-কৃষ্ণ পৃথক পৃথক কায়-ব্যূহে ছিলেন, এখন এক আধারে উভয়ে মিলিত

হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের এক অংশ কৃষ্ণ এবং অপর অংশ রাধা। মহাপ্রভুর এক অংশ কৃষ্ণ অপরাংশ রাধিকার উদ্দেশে যখন অভিসার করে তখনই হয় মানস-অভিসার। বিদ্যাপতির মানস-অভিসারের পদে অবশ্য এ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা নাই, থাকিবার কথাও নয়।

দ্বন্দ্ব নাট্যকৌশলের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই শ্রেণীর পদগুলির ভিতর দিয়া রাধিকার যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দ্বারা তিনি আমাদের কাছে অধিকতর মানবিকা হইয়া উঠিয়াছেন। এবং তাঁহার চরিত্রটিও নাট্যশিল্পসম্মতভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনও আসে নাই, প্রেমের প্রথমাবস্থা পূর্বরাগেই তাঁহার প্রেমে এমন প্রগাঢ় পরিপক্কতা আসিয়াছে যে কৃষ্ণের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন। সত্য বটে, তিনি কাল-পরিবাদের জন্য কাজরের সাধ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যমুনার ঘাটে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কেবলই আত্মছলনা, আত্মদ্বন্দ্ব নয়। চণ্ডীদাসের রাধিকার চিত্ত স্থির-অচঞ্চল-নির্দ্বন্দ্ব। বিদ্যাপতির রাধিকার অন্তর দ্বন্দ্বসংকুল, তাই তিনি অধিকতর বাস্তব ও মানবিক।

৩॥ আর-এক শ্রেণীর পদ আছে, সেগুলির মধ্যে পথ এবং প্রতিবেশ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় প্রেমের গভীরতা এবং তীব্রতা আরও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। হরির এমনি আকর্ষণ যে তাহাতে যে কেবল কুলগৌরব পতিব্রতাধর্ম লৌকিক সংস্কারের মোহ উপেক্ষা করা চলে তাহা নয়— অন্ধকার রাত্রি, অবিরাম ধারাপতনধ্বনি, দুস্তর কর্দমপিচ্ছিল সর্পসংকুল পথ, ইহার কিছুই আর পথরোধ করিতে পারে না হরির মুরলীধ্বনি যখন কানে আসিয়া বাজে—

বাট বিকট ফণি মালা।
চৌদিস বরিসএ জলধর জালা॥
হে মাধব বাহু তরিএ নারি ভাগে।
কতএ ভীতি জোঁ দৃঢ় অনুরাগে॥

নিজ গৃহ-মন্দির হইতে দুই-চারি পা বাড়াইতেই ঘন ঘন বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। মহী জলপূর্ণ হইল। পথও বড় পিচ্ছিল। নিতম্বগুরু কতবার পড়িয়া যায়। কোনো অবলম্বন নাই, বিজলীর ছটা মেঘ দেখায়। জলধারার অবলম্বনে উঠিতে যাই। একগুণ অন্ধকার লক্ষগুণ হইল। উত্তর-দক্ষিণের জ্ঞান দূরীভূত হইল। সখী বলিতেছেন, হে সখি, তুমি ছাড়া এই নিশিতে আর কে অভিসারে আসিতে পারিত। বিকট সর্পসকল পথে ভ্রমণ করিতেছে, কর্দমাক্ত পথ, বিজলীর আলোকে পথ চলিতে হইতেছে।

বর্ষা-অভিসারের পথ ও প্রতিবেশ-বর্ণনায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। ইতস্ততঃ কয়েকটি পদ পড়িলেই তাহা বোঝা যাইবে। যেমন—

কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি।
তুঅ অভিসার ন জীএ বর নারি॥
বরাহ মহিস মৃগ পালে পালায়।
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরায়॥
ফণি মণি দীপ ভরম দুই ফুক।
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ॥

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অভিসারের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, পথ ও প্রতিবেশ

-বর্ণনা সেই বিভিন্ন পর্যায়ের একটি বিশেষ পর্যায়। মনে হয়, এই পর্যায়ের কবিতায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব সর্বাধিক।

এই স্তরের পদগুলির মধ্যে দেখি রাধিকা আর পূর্বের মত ভীরু লজ্জিত নন, অভিসারে আর তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জা-সংকোচ নাই, উপরন্তু অভিসারের জন্য এতখানি কৃচ্ছ্র সাধনা করিতেছেন। রাধিকা এখন সম্পূর্ণ সপ্রতিভা। তিনি সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, আজ আমি যাইব, গৃহের গুরুজনকে ভয় করিব না, আকাশ ব্যাপিয়া যদি সহস্র চন্দ্রও উদিত হয় তাহা হইলেও আমি শ্বেত বসনে অঙ্গ আবৃত করিব, ধীরে ধীরে গমন করিব। রাধিকার এই দুর্জয় প্রেমাকুলতা, এই সর্বভীতিনাশক প্রেমোৎকণ্ঠার চিত্র কতকগুলি পদে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার মধ্যে এই পদটি উল্লেখযোগ্য—

নব অনুরাগিণি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান॥
জামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হিয়-উজিয়ার॥
বিঘিন বিথারল বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥

৪॥ আর-এক শ্রেণীর পদ আছে, সেগুলিতে অভিসারের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। রাধিকার অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া অন্যান্য সখীবৃন্দ ননদিনী প্রভৃতি রাধিকাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং রাধিকা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। সংখ্যায় এই শ্রেণীর পদ খুব বেশি নয়।

৫॥ মূলতঃ মান-সম্বন্ধীয় কিন্তু অভিসারের সহিত সম্পর্কিত কতগুলি পদ আছে। দুর্গম পথে অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকা-রাধিকা যখন মাধবের কুঞ্জে আসিয়া পৌছিলেন তখন কুঞ্জ শূন্য। মাধব নাই। কয়েকটি পদে রাধিকার এই খেদোক্তি আছে, এবং ইহার ক্রমপরিণতিস্বরূপ আরও কয়েকটি পদ আছে তাহাতে রাধিকা মান করিয়াছেন। মাধব কুঞ্জে ছিলেন না। এখন অঙ্গে নারী-উপভোগের চিহ্ন মাখিয়া রাধিকার সম্মুখে উপস্থিত। খণ্ডিতা নায়িকার মান এবং মাধবের মানভঙ্গ-চেষ্টা কতগুলি পদে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অভিসারের পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

অভিসারের পূর্বপ্রস্তুতি, মূল অভিসার, অভিসারের পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্ত্য স্তরের ভিতর দিয়া বিদ্যাপতি অভিসারের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। এবং দেখা গিয়াছে এই বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া রাধা-মানস কিভাবে বিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানে বিদ্যাপতির নাট্য-শিল্পবোধের পরিচয়। নাটকে যেমন একটা সুঠাম গঠন, আদি-মধ্য-অন্ত্য পর্বের ভিতর দিয়া সমগ্র ঘটনাসংস্থানের ভিতর যে একটা গভীর ঐক্য প্রকাশ পায়— কেবল অভিসারের নয়, বিদ্যাপতির প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের পদে তাহা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিরহ-পর্যায়ের কবিতায়।

বিদ্যাপতি অভিসার-যাত্রাকালে নায়িকার অঙ্গ-সজ্জা বর্ণনায় জয়দেবের অনুসরণ করিয়াছেন— 'চরণ নূপুর উপর সারী। মুখর মেখলা কর নিবারী'। জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই 'মুখরমধীরং

ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্। চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয়নীলনিচোলম্'। সমস্ত পারিপার্শ্বিক এমন নিস্তব্ধ যে সখী রাধিকাকে বলিতেছেন যে মাধব 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপজানম্। রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্'। পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বর্ণনায় বিদ্যাপতি মোটামুটিভাবে জয়দেবকেই অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু ইহারই বিপরীত একটি চিত্র পাই চৈতন্য-পরবর্তী কবি জ্ঞানদাসের 'শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা' এই পদটিতে—'আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥ রবাব-খমক-বীণা সুমিল করিয়া। প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া'। অভিসার একটি গোপন ব্যাপার; লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে নির্জনে নায়কের সঙ্গে গোপন মিলন-যাত্রাই অভিসার। রবার-খমক-বীণা সুমিল করিয়া কেহ অভিসারে বাহির হয় না, আর জয় জয় দিয়াও কেহ নিভৃত-কুঞ্জে প্রবেশ করে না; বলা বাহুল্য, ইহা রাধিকার অভিসার-বর্ণনার ছদ্মবেশে মহাপ্রভুর নামাভিসারেরই বর্ণনা।

সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের পদের উপর অতি নগণ্য। বাহ্যতঃ কোনো কোনো জায়গায় জয়দেবের প্রভাব পড়িলেও (প্রতিবেশ-বর্ণনায় বা নায়িকার অঙ্গ-সজ্জা-অলংকরণে) বিদ্যাপতি জয়দেবকে ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্বে অভিসারিকা রাধিকার এমন দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গী আর কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই; তা ছাড়া প্রতিবেশ-বর্ণনারই বা কি মহিমা। সূক্ষ্ম খণ্ড কতকগুলি চিত্রের ভিতর দিয়া এমন অখণ্ড-সার্থক পরিপূর্ণ চিত্র আর কোনো কবি আঁকিতে পারেন নাই। সেদিক দিয়া পূর্ববর্তীদের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির কবি-শক্তি অপরিসীম।

পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদের উপরও বিদ্যাপতির প্রভাব প্রচুর। কোনো কোনো পর্যায়ের কবিতায় বিদ্যাপতি পরবর্তীদের সহিত তুলনায়ও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অভিসার-পর্যায়ের কবিতায়, মনে হয়, বিদ্যাপতির প্রভাব স্বীকরণ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাপতির অভিসার-বিষয়ক পদ সংখ্যায় অনেক, আশিটিরও বেশি। কিন্তু ইহার মধ্যে খাঁটি অভিসারের পদ অর্থাৎ অভিসারের মূল ভাবব্যঞ্জনা যে পদগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সংখ্যায় সেগুলি খুব বেশি নয়। অধিকাংশ পদই অভিসারের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা। আবার মূল অভিসার-বিষয়ক পদগুলির মধ্যেও প্রেমের যে তীব্রগতি ঠিক যেমন ভাবে ফুটিয়া ওঠা উচিত ছিল ঠিক তেমনটি ফুটিয়া ওঠে নাই বলিয়া মনে হয়। প্রতিবেশসৌন্দর্য-বর্ণনার উপর রাধিকার প্রেমাকুলতার উপর যেন আরও জোর দেওয়া উচিত ছিল। অভিসার-পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে গতি ও আবেগ সঞ্চার করা একটু শক্ত। অভিসারিকা রাধিকাকে সচল করিয়া দেখানো যায় না, কারণ পথের কৃচ্ছ্রসাধনার বর্ণনা বা গুরুকুলজনের ভয়ের কথা সমস্তই সখী বা রাধিকার উক্তির ভিতর প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে প্রত্যক্ষ ঘটনার অবতারণা সম্ভব নয়, সেখানে একমাত্র উপায় অপ্রত্যক্ষ ঘটনার উপর প্রত্যক্ষের উত্তাপ ও গতি সঞ্চার করা, যে বর্ণনা রাধা বা দূতীর স্মৃতির মাধ্যমে আসিয়া আবেগ হারায় তাহার উপর সাহিত্যিক কৌশলে কৃত্রিম আবেগ সঞ্চার করা। এই উপায়ে একমাত্র অবলম্বন চিত্ররীতির প্রাধান্য এবং নাটকীয় কৌশলে বস্তুলীন (objective) ঘটনাবিবৃতি। এই উভয় প্রক্রিয়াতেই বিদ্যাপতি সিদ্ধহস্ত; তাহার প্রমাণ আছে অন্য পর্যায়ের পদগুলিতে। কিন্তু এই পর্যায়ের কবিতায় এই দুই রীতি অবলম্বন করিয়াও

বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন না। গোবিন্দদাস পথের বর্ণনায় বিশেষ করিয়া চিত্র-ধর্ম এবং নাট্যকৌশলের অবতারণা করিয়া অভিসার-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে এক অনন্যসাধারণ কাব্যসৌন্দর্য আরোপ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের অভিসার-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে এই পদটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ—

মাধব, কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদচারি আগুলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিএ
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥

রাধিকা যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এই বর্ণনার ভিতর দিয়া রাধিকার দ্রুত নিশ্বাস পতন-ধ্বনিটিও যেন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই মাত্র অন্ধকার রজনীতে যে দুর্গম পথ একাকী নারী অতিক্রম করিয়া আসিল তাহার বর্ণনা রূপকথার বর্ণনার মত নয়, ইনাইয়া-বিনাইয়া সমস্ত কিছুর উপর রং চড়াইয়া তাহার বর্ণনা করিলে চলিবে না, প্রচণ্ড গতিতে দুই-একটি অর্থপূর্ণ গূঢ়স্বচ্ছ ইঙ্গিতের সাহায্যে সমস্ত চিত্রখানিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে; কোথাও দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিবার স্থান নাই। 'তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিএ পথযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ'— পদযুগে ভুজঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল তাহাতেই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, সে ভুজঙ্গ ফণা ধরিয়া দংশন করিয়াছিল কি না, কেমন করিয়া রাধিকা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সৌন্দর্য হানিকর হইত। ইহার পর 'একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী ঘোর পহন অতিদূর'। শুধু কুলকামিনী বলিয়াই কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন, কুলকামিনীর পক্ষে অভিসারে বাহির হওয়া যে কতদিক দিয়া কত বিপদ সে কথা ভাবিয়া দেখিবার ভার পাঠকের উপর। 'একে কুলকামিনী' তাহার পর আবার 'কুহুযামিনী', শুধু তাই নয়—'ঘোরপহন অতিদূর'। অতি সংক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশের ভিতর দিয়া কবি সমগ্র অর্থটি প্রকাশ করিয়াছেন। এ কাজ শক্তিশালী কবি ছাড়া সম্ভব হয় না। কবির অনুভূতি যখন গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয়, নায়ক-নায়িকার ভাবের দ্বারা কবি যখন আচ্ছন্ন হন, তখনই প্রকাশভঙ্গীতে এই প্রকারের স্বচ্ছতা এবং গভীরতা আসে। এই প্রসঙ্গে 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটি স্মরণ করা যায়। পদটির রচয়িতা যিনিই হউন শুধু প্রকাশভঙ্গীটি লক্ষণীয়। গোবিন্দদাসের এই পদটির সঙ্গে তুলনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, এই দুইটি পদে কবির অনুভূতি কি গভীর ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে।

এই ব্যঞ্জনাধর্মী-অর্থগূঢ় সংক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ ব্যবহার করিবার অন্য কারণও আছে। রাধিকার অভিসার-আগমনের পথকষ্টের বর্ণনা দিতেই হইবে নতুবা তাঁহার প্রেমের কৃচ্ছ্রসাধনতৎপরতার দিকটি প্রস্ফুটিত হয় না; আবার খুব বিস্তৃত বিবরণও দিবার উপায় নাই। কারণ সমস্ত পথবর্ণনা রাধিকার উক্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে; রাধিকা নিজে যদি তাঁহার পথ-আগমনকষ্টের কথা খুব বড় করিয়া বর্ণনা করেন তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেম লঘু হইয়া যায়। তোমার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় কুল-মান-লজ্জা ত্যাগ

করিয়াছি ; পথের কষ্ট সে তো• বাহ্য ; তোমার সহিত মিলনানন্দে সে দুঃখের প্রতিটি স্মৃতি মুছিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়, তোমার সহিত যে মিলন হইবে সে মিলন তো সাধারণ নয়, সে মিলনের পথ কণ্টকাকীর্ণ কর্দমপিচ্ছিল সর্পসংকুল, কিন্তু সে কথা কে বড় করিয়া দেখিবে ? এইভাবে স্বচ্ছ ও সহজ বর্ণনার ভিতর দিয়া অভিসারের অধ্যাত্ম-তাৎপর্য বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। গোবিন্দদাসের আলোচ্য পদটিতে যতখানি সৌন্দর্য বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের কোনো পদে এতখানি সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতির রাধিকাও ঠিক এমনই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকার বক্ষস্পন্দন-ধ্বনি আমাদের হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করে নাই।

পরিশেষে আলোচ্য অভিসারের অধ্যাত্মব্যঞ্জনাটি কি ? অনেকে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে জীবাত্মাপরমাত্মার লীলা বলিয়া মনে করেন এবং অভিসারকেও পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আকর্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনসম্মত নয়। তাঁহাদের মতে রাধিকা এবং কৃষ্ণ স্বরূপত একই। যোগমায়ার বসে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ আপন হ্লাদিনী অংশভূত রাধিকার সহিত লীলা করেন ; রাধিকা কি করেন— তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি বিভিন্ন রসের গুণগুলি অঙ্গীকার করিয়া আর-একটি স্বতন্ত্র গুণাধিকারিণী। তিনি নিজ অঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা করেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণসেবারই নামান্তর। অভিসারের পদগুলির ভিতর দিয়া স্বাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা করিবার অসীম ব্যাকুলতা এবং তাহার জন্য সর্বপ্রকার কষ্টস্বীকার, ও কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়া কৃষ্ণপ্রেমেরই নিবিড়তা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বরাগে-বিরহে প্রেমের যে অসীম প্রতাপ, অভিসার-পর্যায়ের পদেও প্রেমের সেই অপ্রতিহত প্রভাব। ইহারই সহিত রাধিকার প্রেম গভীর সাংকেতিকতার সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই অভিসারের তাৎপর্য।

বিদ্যাপতির অভিসার-পর্যায়ের পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া নায়িকার মানস-বিবর্তনের ক্রমপর্যায়গুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। অভিসারের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণে এবং তুলনা-মূলক আলোচনায় এই স্তরনির্দেশের সূত্রটি হয়তো বহু জায়গায় হারাইয়া গিয়াছে, এইবার বিরহ-পদাবলীর আলোচনায় সেই সূত্রটি আবার ধরিতে চেষ্টা করা যাইবে।

৩

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের পদগুলিতে যে ভাববিশুদ্ধি দেখা যায় তাহার মূলে আছে চৈতন্যের জীবন। মহাপ্রভুর জীবনে যে লীলা প্রত্যক্ষীভূত হইল তাহাই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের নিকট আদর্শ হইয়া রহিল। চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্য লৌকিক প্রণয়কাহিনীমূলক না হইলেও তাহা ছিল আদি-রসাত্মক। মহাপ্রভু যে প্রেমের প্রবর্তন করিলেন সে প্রেম সাধারণ প্রেম নয়। এ প্রেমের কষ্টিপাথর বিরহ। মহাপ্রভু বলিলেন, 'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে'। গোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষ যুগযুগান্তর বলিয়া মনে হয়, সমস্ত জগৎ মনে হয় শূন্য। ইহাই প্রেমের আদর্শ। কিন্তু বিদ্যাপতি যদিও চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি এবং বিশেষ করিয়া রূপসম্ভোগের কবি বলিয়া পরিচিত, তবু বিরহ-পদগুলির বিচারে বিদ্যাপতি পরবর্তী পদকর্তাদের সহিত সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন। যে ভাববিশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ পরবর্তীকালের পদকর্তাদের রচনায় ঠিক সেই সুরই বিদ্যাপতির বিরহ-কবিতায়। ইহার কারণ, কি ঐশী প্রেম, কি লৌকিক প্রেম— মিলনের মধ্যে

একটা স্থূলতা একটা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে। মিলনের অর্থ দেহসম্ভোগ, দেহকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার বিস্তার। কিন্তু বিরহের মধ্যে আছে একটা উদার ব্যাপ্তি, একটা সার্বভৌম বিস্তৃতি। বিরহিণী নায়িকার মধ্যে তাই আপনা হইতেই একটা বৈরাগ্যের সুর বাজিয়া ওঠে। রাধাকৃষ্ণের মিলনে রাধার দৃষ্টি, তাহার চিন্তা-ভাবনা কৃষ্ণকেই কেন্দ্র করিয়া। তখন 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া কৃষ্ণে কেন্দ্রস্থ হইয়াছে। কিন্তু বিরহে সে সংকীর্ণতা বা স্থূলতার চিহ্ন মাত্র নাই। বিরহিণী রাধিকা কৃষ্ণকে সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছেন, কৃষ্ণ তখন নববর্ষার জলভারমন্থর মেঘমালায়, শ্যামল বনশ্রেণীতে, কালিন্দীর কালো-জলে। বেণুবনের মর্মরধ্বনির মধ্যে তখন শোনা যায় কৃষ্ণের মোহন-মুরলী-ধ্বনি। বিশ্ব সংকীর্ণ হইয়া কৃষ্ণে রূপপরিগ্রহ করে নাই, কৃষ্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন নিখিল বিশ্বে। নিখিলের সুর তখন তাহাদের সে প্রেমলীলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তের স্পর্শ সে ভোগবাসনাকে বিপুলব্যাপ্তি উদার বিস্তৃতির মহিমা দান করিয়াছে। পার্থিব প্রেমকে স্থাপন করিয়াছে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধামে। সংস্কৃত কবি তাই বলিয়াছেন, 'সঙ্গমবিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো, মিলনে সৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'।

বিদ্যাপতির বিরহ-পদাবলীর আধ্যাত্মিক-ভাব-বিশুদ্ধির কথা বলিতে গিয়া এত কথার ভূমিকা করিতে হইল, ইহার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধারণ পাঠক এবং সমালোচক বিদ্যাপতিকে জানেন রূপসম্ভোগের কবি বলিয়া, যেমন জানেন কালিদাসকে। এইসমস্ত ব্যাখ্যা ও টীকাকারদের প্রধান অবলম্বন বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি এবং তাঁহার ব্যবহৃত উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকারগুলি।

বিদ্যাপতি এমন কতকগুলি উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করিয়াছেন যাহা প্রকৃতই অত্যন্ত অশ্লীল। উদ্ধৃতি দিতে চাই না, কৌতূহলী পাঠক তাঁহার মান-পর্যায়ের পদগুলি খুঁজিলে ইহার প্রচুর উদাহরণ পাইবেন। ইহা অবশ্য মুখ্যতঃ রাজ-প্রতিবেশ প্রভাব। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতির পক্ষে আর-একটি কথা বলিবার আছে। বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতির গীতিপ্রবণতার সঙ্গেসঙ্গে একটা নাট্যশিল্পবোধ ছিল। তিনি তাঁহার রাধিকাকে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একটি পরিকল্পিত পরিণতির দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন এবং এই রাধিকা-চরিত্রের ক্রমবিকাশের নানা স্তর আছে। যাঁহারা বিদ্যাপতির পদাবলীর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা ইহার যে-কোনো একটি স্তরের উপর দাঁড়াইয়া বিদ্যাপতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করিতে পারেন না। অংশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র সম্বন্ধে মন্তব্য করা কবির উপর অবিচার করা। রবীন্দ্রনাথ যখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি রচনা করেন তখন অনেকে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি ভিত্তি করিয়া তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর সমালোচকদের উদ্দেশ্যে পরে কবিকে তাঁহার কাব্যপ্রবাহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল যে, কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি তাঁহার কাব্যজীবনের শেষ কথা নয়, ইহা তাঁহার কাব্যসৌধের একটা সোপান মাত্র। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর যে অবিচার হইয়াছিল বাঙালীপাঠক আজিও বিদ্যাপতির উপর সেইরকম অবিচার করিতেছেন।

এখন, বিদ্যাপতির কথা উঠিলেই আমরা তাড়াতাড়ি হাতের কাছের চণ্ডীদাসকে স্মরণ করি এবং উভয় কবির কাব্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া সমস্ত সমস্যার একটা সুলভ মীমাংসা করিয়া

ফেলি। কিন্তু চণ্ডীদাসের কবিপ্রকৃতির স্বরূপ বিদ্যাপতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চণ্ডীদাসের রাধিকার ভিতর-বাহির জন্মজন্মান্তর হইতে গেরুয়া রঙে ছোপানো, তাঁহার কোনো পরিবর্তনও নাই বিবর্তনও নাই; কিন্তু বিদ্যাপতি যে রাধিকাকে তাঁহার পদাবলীর কেন্দ্রস্থ চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন সে একটি সাধারণ নবোদ্ভিন্নযৌবনা বালিকা। শ্যামকে সে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনো পূর্বসংস্কারের প্রভাব নাই। এ রাধিকার কাছে কৃষ্ণ 'সর্বকারণকারণম্' নয়। এ প্রেম নিতান্ত প্রাণের আবেগে প্রেম, যৌবনধর্মের প্রেম। চণ্ডীদাসের রাধিকার কিন্তু এ প্রাণের আবেগ নাই। বিদ্যাপতি দেখাইয়াছেন, প্রাকৃত প্রেম কি করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলায় পর্যবসিত হয়। সেইজন্য প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলা দুইটি বিপরীতধর্মী প্রেমের চিত্র তাঁহাকে পাশাপাশি রাখিতে হইয়াছে। তিনি পার্থিব প্রেমের সহিত অপার্থিব প্রেমের সূত্র যোজনা করিয়াছেন। পার্থিব প্রেমের বর্ণনায় মর্ত্যের মাটির গন্ধ একটুও গোপন রাখেন নাই, আবার সেইখানেই না থামিয়া সে প্রেমলীলাকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধিকাকে দেখি 'যোগিনীপারা'। পূর্বরাগ-মিলন-অভিসারের সে উন্মত্ত উদ্দামতা, সে ভোগলুব্ধ চটুলতা স্তিমিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত নম্র মঙ্গলশ্রী দান করিয়াছে। ইহাই রাধিকার অন্তিম পরিণতি। এই বিরহিণী রাধিকাই বিদ্যাপতির উদ্দিষ্টা রাধিকা। দক্ষ নাট্যকারের মত বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া, ভোগের অগ্নিশিখায় সমস্ত স্থূলতা দগ্ধ করিয়া কবি রাধিকাকে পরিণতিতে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। তখন রাধিকার প্রেম মার্ত্যদেহ পরিহার করিয়া স্বর্গাভিমুখী হইয়াছে। বিদ্যাপতি যে সূত্রে পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমকে গাঁথিয়াছেন রসিক পাঠক সেই সূত্রটি অন্বেষণ করিবেন। কেবলমাত্র একটি বিশেষ স্তরের উপর ভিত্তি করিয়া, চূড়ান্ত তো দূরের কথা, কোনো প্রকারের মন্তব্যই করা চলে না। অনুরূপ ব্যাখ্যা কালিদাসের কাব্যেও হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন সাধারণ সমালোচকদের এই মন্তব্যগুলি কতখানি একদেশদর্শী।

৪

বিদ্যাপতির বিরহ-পদগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীভাগ লক্ষ্য করা যায়। আর এই বিভিন্ন শ্রেণীর পদের ভিতর দিয়া নায়িকার মানস-পরিবর্তনের ধারাটি অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম স্তরে দেখি স্থূল ভোগলালসার প্রতি রাধিকার তখনও পূর্ণ আকর্ষণ রহিয়াছে। কৃষ্ণ-বিরহ তখন তাঁহার নিকট ভোগ-বিরহেরই নামান্তর। কৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার পরিপূর্ণ যৌবন বিফল হইয়া গেল, তাঁহার ভোগবাসনা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই তবু কান্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল— এই ক্রন্দনের সুরই এই শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ যে রাধিকাকে 'বিনু দোষে পরিহরি গেল' এবং তাহাতে রাধিকার 'যৌবন জনম বিফল ভেল', এই জীবন-যৌবনের জন্য ভোগের জন্য ক্রন্দনই এই শ্রেণীর পদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রেমের যে চরমোৎকর্ষের অবস্থায় নায়কের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল ভাব আসা সম্ভব, যে অবস্থায় সংশয়-সন্দেহ-নৈরাশ্য দূরীভূত হয়, রাধিকার তখনও সে অবস্থা আসে নাই। এখনও তীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুরের মত সংশয়-সন্দেহ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে, তাই বিদেশ যাত্রাকালে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরোধ এই—

মধুকর যদি কর রাব।
যদি পিক পঞ্চম গাব॥
তখনে করব অনুমান।
মুদি রহব বরু কান॥
পরতিরি মানব-তীতি।
ধিরজে মনোভব জীতি॥

এই শ্রেণীর পদ সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

দ্বিতীয় স্তরে ভোগবহ্নি অনেকখানি নির্বাপিত হইয়াছে কিন্তু অন্তরের সে উদ্বেলতা এখনও বর্তমান। প্রথম স্তরে ভোগের জন্য ক্রন্দন, যখন দেখা গেল সে ক্রন্দন নিষ্ফল, তখন যে এই ভোগ-বিরহ ঘটাইয়াছে তাহার উপর আক্রোশ ও তাহাকে ভৎর্সনা। এই স্তরের কবিতাগুলির মর্মার্থ 'পহু কপটক গেহ'। কৃষ্ণের প্রেমের কোনো মহিমাই রাধিকা এখন স্বীকার করিতেছেন না— 'জৌবন রূপ আছল দিন চারি। সে দেখি আদর কএল মুরারী'। নায়ক কৃষ্ণকে তিনি অতি সাধারণ কামান্ধ প্রাকৃত নায়কের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ চতুর কপট ভণ্ড। রাধিকার দেহযৌবনে মুগ্ধ হইয়া কয়েকদিনের জন্য তাঁহার উপর আসক্ত হইয়াছিলেন, এখন নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের উপর এই তীক্ষ্ণ ভৎর্সনা ও কঠিন দোষারোপ প্রকাশ পাইয়াছে আলোচ্য স্তরের পদগুলির মধ্যে। সংখ্যায় এই পদগুলি খুব কম নয়।

তৃতীয় স্তরে দেখি, বিরহ-বহ্নি রাধিকার অন্তরের সোনাকে অনেকখানি নিকষিত করিয়া তুলিয়াছে। যে ভোগলুব্ধতা, যে সংশয় আবেগ উৎকণ্ঠা, প্রতারকের প্রতি প্রতারিতের যে মর্মভেদী অভিশাপ তাহার সমস্তই সংযত হইয়া রাধিকাকে এখন পরম বিষাদময়ী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকার অন্তিম পরিণতি এইখানেই নয়— এখনও কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা, তাঁহার অভাবের তীব্র বেদনা, গোকুলে তাঁহার অসংখ্য স্মৃতি তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। প্রথম-দ্বিতীয় স্তরে রাধিকার ভোগলুব্ধতার জন্য তাঁহার বেদনা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। এখন হইতে রাধিকার বিরহ-বেদনা আমাদের অন্তরের অশ্রুসাগরকে উদ্বেলিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতিবোধকে জাগ্রত করিতেছে। এতক্ষণ তাঁহার চঞ্চলতা, তাঁহার ঔদ্ধত্য, তাঁহার যৌবনমদগর্বিত স্পর্ধিত দম্ভ আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণের পক্ষে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এখন কৃষ্ণ-বিরহে গোকুলের করুণ পরিবেশের পটভূমিকায় কবি রাধিকার যে করুণ চিত্রখানি আঁকিয়াছেন তাহা প্রকৃতই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে—

সূণ ভেল মন্দির সূণ ভেল নগরী।
সূণ ভেল মন্দির সূণ ভেল সগরী॥
কৈসনে যাওব যমুনাতীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটীর॥

চতুর্থ স্তরে রাধিকাকে দেখি বৈরাগিণী রূপে। ইহাই বিদ্যাপতির রাধিকা, ইহাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতিনাট্যের চরম পরিণতি। বয়ঃসন্ধি-পূর্বরাগ-মিলন-মান-অভিসার প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে রাধিকা-চরিত্র ক্রমশ মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল বিরহের চতুর্থ পর্যায়ে সেই পূর্ণ মুকুলিত রাধিকাকে

দেখিলাম। সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা, সমস্ত প্রগল্‌ভতা, বিরহের অশ্রুপ্লাবনে ধৌত হইয়া গিয়াছে, রাধিকা এখন দিব্য-অম্লান-শোভনশ্রী। রাধিকার এ রূপের সঙ্গে বয়ঃসন্ধির রাধিকার রূপের মধ্যে বহু পার্থক্য। সে রূপ ভোগের, এ রূপ ভোগাতীতের। সে রূপ রাধিকাকে দিয়াছে চিরচঞ্চলতা, এ রূপ দিয়াছে চিরশান্তি। এই স্তরে দেখি, যে কৃষ্ণকে তিনি নিজ ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য দায়ী করিয়াছিলেন, যাহাকে ভণ্ড-কপট বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণের উপর তাঁহার আর-কোনো অভিযোগ নাই। তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিত। তাই অন্তিম প্রার্থনা—

মোরি অবিনএ জত পরলি থেওঁব তত
চিতে সুমরিব মোরি নামে॥

যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে প্রাণ আকুল হইয়াছিল এখন তাঁহার স্মৃতিতে বাঁচিয়া থাকাতেই চরম সার্থকতা মনে হইতেছে। যে রাধিকা কৃষ্ণের মথুরা যাইবার সময় উপদেশ দিয়াছিলেন—'পরতিরি মানব তীতি'— এখন তিনিই বলিতেছেন সহস্র রমণীর সহিত সে সহস্র রজনী যাপন করুক, কিন্তু 'চিতে সুমরিব মোরি নামে'— আমার কথা তাঁহার চিত্তে যেন একবার উদিত হয়, আমার কথা যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া না যায়। তাহাতেই রাধিকার শান্তি। দৈহিক ভোগবন্ধনের মধ্যে তাঁহাকে আর বাঁধিতে সাধ যায় না। সে চেষ্টা একবার তো হইয়াছে। দেহের বন্ধন খুলিয়া যায়। তাই যাহার সঙ্গে ছিল দেহের সম্পর্ক এখন তাহার সঙ্গে স্থাপিত হইল চিত্তের সম্পর্ক। বাহিরের গ্রন্থিবন্ধন শিথিল হইয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু অন্তরের যে নিবিড় সংশ্লেষ তাহা তো অচ্ছেদ্য। দূতী আসিয়া সংবাদ দিল— কৃষ্ণ কুব্জার সহিত রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও রাধিকার চাঞ্চল্য নাই। তিনি বলিলেন—

ও তহু রহথু গঅ ফিরি।
হে সখি, দরসন দেখু একবেরি।

ইহা রাধিকার অভিমান নয়, পরিণতি। অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণবিন্দুর মত রাধিকার এ প্রেম উজ্জ্বল, অম্লানরেখ। মহৎ প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়। এখন রাধিকার এ প্রেম প্রকৃতই মহৎ। যাঁহার জন্য সমস্ত জীবন ঊষর হইয়া গেল, যাঁহার বাঁশির ধ্বনি অনুসরণ করিয়া সমস্ত কুল-শীল-লজ্জা-ভয় বিসর্জন দিয়া আসিলাম, আজ সে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার জন্য কাহারও উপর অভিমান নাই, ভাগ্যকে দোষারোপ নাই, প্রতারককে ভর্ৎসনা নাই, কোনো অনুশোচনা কোনো গ্লানি কিছুই ইহাকে স্পর্শ করে নাই। যাঁহার জন্য লৌকিক সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিলাম সে ফিরিয়া তাকাইল কি না, সে আমার দেহ-যৌবনকে গ্রহণ করিল কি না সে বিচার কে করিবে? তাঁহার জন্য আমি কতখানি ত্যাগ করিতে পারিলাম, পশ্চাতের কোনো বন্ধন সম্মুখের সেই মহাকর্ষণে বাধা দিয়াছে কি না তাহাই দেখিতে হইবে। ইহাই রাধিকার প্রেম। চৈতন্যদেব জীবন দ্বারা এই প্রেমকেই প্রত্যক্ষীভূত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রেমের স্পর্শে রাধিকার উদ্বেল অন্তর যখন শান্ত হইয়াছে তখনকার একখানি চমৎকার চিত্র বিদ্যাপতি আঁকিয়াছেন—

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে॥
উরপর সামরি বেণী।
কমল কোস জনি করি নাগিণী॥

কেও সখি তাকএ নিশাসে।
কেও নলিনী দলে কর বাতাসে॥
কেও বোল আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরী।

নদী যখন তটবন্ধনে আবদ্ধ, তীরের সীমায় সীমিত, তখনই তাহার উদ্দাম কলরোল, উচ্ছ্বসিত আবেগ; কিন্তু উচ্ছ্বাস-আবেগ-প্রগল্‌ভতা সমস্তই শান্ত সমাহিত স্তব্ধ হইয়া যায় যখন সে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিদ্যাপতির রাধিকা যখন মিলন-মান-অভিসারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তখন তাঁহার প্রগল্‌ভতা ছিল, চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু বিরহের সীমাহীন অকূলতার মধ্যে রাধিকা শান্ত কোমলশ্রী ধারণ করিয়াছে। তখন বিরহ-মিলন কিছুই তাহার শান্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে না। প্রেমের এই চরম অবস্থায় 'অনুখন মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলি মধাঈ'। অগভীর জলে তরঙ্গোৎক্ষেপ বেশি; রাধিকার প্রেম যখন অগভীর ছিল তখন তাহাতে মান-অভিমানের, দ্বন্দ্ব-সংশয়ের তরঙ্গোৎক্ষেপ হইয়াছে, কিন্তু বিরহের গভীর প্রেমে তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই, নিষ্কম্প সরোবরের বক্ষের মত তাহাতে ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গও লক্ষ্য করা যায় না। প্রেমের এই গভীর অবস্থায় পাওয়া-না-পাওয়া বিরহ-মিলনের কোনো পার্থক্য নাই, তাই বিদ্যাপতির রাধিকা বলেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

বিরহের এই চারিটি স্তর। এখন, বিশ্লেষিত এই চারিটি স্তরের মধ্যে কোন্ স্তরের কবিতাগুলি বিরহের পদ হিসাবে শ্রেষ্ঠ এবং সে শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারের মানদণ্ডই বা কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

বিরহের উৎপত্তি অভাব হইতে, তাই একটা অভাববোধ সমস্ত বিরহ-কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিরহ মিলন নয়, একটা কিছু হারাইয়াছে— সেই হারাইয়া যাওয়া জিনিসটির জন্য ক্রন্দনই বিরহের ক্রন্দন। কিন্তু এ ক্রন্দন আত্মগত ক্রন্দন। নিজে দুঃখ পাইয়াছি বলিয়া অপরকে দুঃখ দিবার চেষ্টা এ ক্রন্দনে নাই। গভীর দুঃখ যেমন চিত্তে একটা শান্ত বৈরাগ্যের সুর জাগাইয়া তোলে, বিরহের কবিতাও ঠিক তেমনি— সমস্ত চিত্ত আজ স্তব্ধ শান্ত। কোথায়ও কোনো অনুযোগ-অভিযোগ নাই। কোনো অনুশোচনা নাই। সমস্ত দুঃখ আমি নিজেই সৃষ্টি করিয়াছি— ইহাই বিরহের কবিতা।

বিদ্যাপতির প্রথম দুইটি স্তরের কবিতাকে ঠিক বিরহের কবিতা বলা যায় না। সেখানে ভোগবাসনা, যৌবনোপভোগের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র, রাধিকাচিত্ত এত চঞ্চল ও উদ্বেলিত যে মনে হয় বিরহের গভীর সুর তাঁহার হৃদয়ে তখনও বাজে নাই। বায়ুতাড়িত জলের উপরিভাগের ন্যায় সামান্য একটুখানি কম্পন, সামান্য একটুখানি ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, গভীর কোনো সুর বাজে না। গভীর বিরহের ক্রন্দন শোনা যায় তৃতীয় স্তরের কবিতায়। চতুর্থ স্তরের কবিতায় সুর এত চড়ানো হইয়াছে, আদর্শবাদ এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে এই পদগুলিকে ভাবসম্মিলনের পূর্বরূপ বলা যায়। আর-একটু সুর চড়াইলেই পদগুলি বিরহের রাজ্য ডিঙাইয়া ভাবসম্মিলনের রাজ্যে পৌঁছাইতে পারিত। এই স্তরের পদগুলিতে দেখা যায়, মিলন আর বিরহে কোনো পার্থক্য নাই এবং যে তীব্র সংযত অভাববোধ বিরহ-কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা এই স্তরের পদগুলিতে অবর্তমান। তাই উচ্চভাবদ্যোতক হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর পদগুলিকে শ্রেষ্ঠ বিরহ-কবিতার পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না।

'সখি হামার দুখক নাহি ওর' পদটি তৃতীয় স্তরের শ্রেষ্ঠ পদ। পদটিতে কাব্যের দুইটি অঙ্গ— চিত্র ও সংগীত, এবং পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এই ত্রিধারার অপরূপ সম্মিলন ঘটিয়াছে।

৫

বিদ্যাপতির পদাবলীকে যদি যথার্থই একখানি সার্থক গীতিনাট্য আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেখিতে হয় এ গীতিনাট্যের মূল ভাবব্যঞ্জনাটি কি। পদগুলিকে যদি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করি তাহা হইলে ইহার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি আবিষ্কার করিতে না পারিলেও বিশেষ কিছু উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ হয় না। কিন্তু ইহাকে একখানি গীতিনাট্য বলিয়া আখ্যা দিতে গেলে ইহার অন্তর্নিহিত অখণ্ড একটা ভাবসূত্রের সন্ধান করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। খণ্ডভাবে প্রত্যেকটি পদের কাব্য-সৌন্দর্য এবং অখণ্ডভাবে ইহাদের মূলভাব-সৌন্দর্য উভয় মিলিয়া পদগুলিকে সার্থক গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য দান করিবে। সুতরাং বিদ্যাপতির সমগ্র পদগুলির মূলভাব-ভিত্তিটি কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

পরিপূর্ণ প্রেম এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন চিত্তের ধ্যানতন্ময়তা। চঞ্চল অস্থিরচিত্তে দৈহিক ভোগলালসা নিয়া যখন পরিপূর্ণ প্রেমের রহস্য ভেদ করিতে যাই, অন্তরের ভাব-ঐশ্বর্যে নয়, দৈহিক রূপ-ঐশ্বর্যের মূল্যে যখন দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইতে চাই— তখন সে মিলনের অন্তে করুণ সুর আপনা হইতেই বাজিয়া ওঠে। কিন্তু রূপের গরিমা ধুলায় লুটাইয়া দিয়া, বাহিরের রূপের সূত্রে নয় অন্তরের ধ্যানের সূত্রে যখন তাহাকে বাঁধিতে যাই তখন সে বন্ধন হয় অক্ষয়, তখন সে মিলনও হয় পরিপূর্ণ। তখনই বলা যায় 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর'।

যৌবন-প্রাণপ্রাচুর্যে রাধিকা চঞ্চল। এতই চঞ্চল যে কৃষ্ণ তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেও পাইলেন না, 'সজনী, ভাল কএ পেখন না ভেল। মেঘমালা সয়ঁ তড়িত লতা জনি হিরদয়ে সেল দঈ গেল'। তিনি যেন তড়িতের চকিত আলোক। একদিকে তাঁহার চঞ্চলতার জন্য তাঁহাকে ভালো করিয়া যেমন দেখা যায় না, আর-একদিকে তাঁহার রূপৈশ্বর্যের দিব্যচ্ছটায় তাঁহার দিকে ভালো করিয়া তাকানোও যায় না। এই অস্থির চঞ্চলতা এবং রূপের ছটাই বিদ্যাপতির রাধিকার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই পরিণামে তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছে।

প্রথমযৌবনের উত্তেজনা এবং আবেগে যখনই রাধিকা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন তখনই তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্তরে তাঁহার জন্য ধ্যানের আসন প্রস্তুত না করিয়াই কেবল বাহ্যিক রূপের মোহে ভুলাইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাকে পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বুঝিতে পারেন নাই, অস্থির হইয়া কেবল জল ঘোলাইয়া তোলা যায়, কোনো মহৎ জিনিস লাভ হয় না। কবি ভণিতায়ও বহু বার তাহাকে সাবধান করিয়াছেন, যখনই তিনি বলিয়াছেন, 'কানু হেরব ছল মন বড় সাধ' তখনই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, 'ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারী'। কিন্তু ধৈরজ ধরিবার শিক্ষা তখনও রাধিকার বাকী। বিদ্যাপতির এই যে উক্তি, 'ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারী' ইহাই তাঁহার প্রেম-সৌন্দর্য সম্বন্ধে আদর্শ। এই আদর্শ-সাম্যে তাঁহাকে কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় কবিগোষ্ঠের সহিত একসূত্রে বাঁধা যায়। প্রেম-সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আদর্শও ইহাই— শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের উপলব্ধি সম্ভব, অস্থিরতার মধ্যে নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃপুরে যে সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিরাজ করিতেছেন, শান্ত সমাহিত

পবিত্র না হইলে তাহার সাক্ষাৎ মিলবে না। বিদ্যাপতির রাধিকা ইহা বুঝিতে না পারিয়া ভুল করিলেন, তিনি দুঃশাসনের মত অস্থির চিত্তে প্রাণশক্তির আবেগে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ফলে নিজেই নিজের ভাগ্যবিপর্যয় ডাকিয়া আনিলেন।

একদিকে রাধিকার এই চঞ্চল অস্থিরতা যেমন তাঁহাকে শান্তি দেয় নাই তেমনি আর-একদিকে তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য-গর্ব এবং চটুল ভোগবাসনা তাঁহার নিজের কাছেই নিজের অস্তিত্বকে বিষাইয়া তুলিয়াছে। ভোগ-তৃষ্ণা তাঁহাকে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ঘুরাইয়া মারিয়াছে আর দেহ-সৌন্দর্য-গৌরব পরিশেষে তাঁহার আত্মগ্লানির আর সীমা রাখে নাই। রাধিকার রূপের তুলনা নাই, দূতির উক্তিতেই প্রকাশ—

সুধামুখি কে বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু তরু লোচনা
কাজর রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝ কাল ভুজঙ্গিনী
সিরিজুত খঞ্জন-খেলা॥

এই সৌন্দর্য তাঁহার কাল হইয়াছে। কৃষ্ণকে তিনি মনে করিয়াছিলেন দেহ-সৌন্দর্যের কাঙাল। বলিয়াছেন, 'যৌবন রূপ অছল দিন চারি। সে দেখি আদর কএল মুরারী'। কিন্তু পরিশেষে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার কাছে যাইতে হইলে সর্বাগ্রে এই বাহ্যিকরূপের আবর্জনা বিসর্জন দিতে হইবে, মুছিয়া ফেলিতে হইবে রূপের গরিমা। রিক্ত, নিঃস্ব, নির্বিকার হইয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিলে তবেই তিনি অভ্যর্থনা করেন। এই বোধ রাধিকার জন্মিয়াছে অনেক পরে, যখন জন্মিয়াছে তখন বলিয়াছেন, 'শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর, তোড়হ গজমতি হার রে'। রাধিকা যখন বাহ্যিক আভরণের অসার্থকতা বুঝিতে পারিলেন, যখন বুঝিলেন রূপের ছটায় তাঁহাকে ভুলানো যাইবে না, অন্তরের সাধনায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তখন—

জত বা জকর লেলে ছলি সুন্দরি
সে সবে সোপলক তাহী।

বহিঃপ্রকৃতি রাধিকার রূপায়নে সহায়তা করিয়াছিল। আজ রাধিকার রূপের প্রয়োজন নাই, তাই তিনি সমস্তই যথাযোগ্য স্থানে ফিরাইয়া দিতেছেন— লোচন-লীলা দিলেন হরিণকে, কেশপাশ চামরীকে, দশনরুচি দাড়িম্বকে, বান্ধুলিকে অধররুচি, সৌদামিনীকে দেহকান্তি দান করিয়া তিনি কাজলের ন্যায় মলিন হইলেন। 'কাজর সনি সখি ভেলী'—এই কাজরের ন্যায় মলিন রাধিকার তুলনা চলে 'নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্বতী'র সঙ্গে। পার্বতী এবং রাধিকা— সৌন্দর্যের অভাব ইঁহাদের কাহারও ছিল না, অভাব ছিল ভাবৈশ্বর্যের। উভয়ের প্রধান অবলম্বন দেহসৌন্দর্য এবং মদন। মদন যে মিলন ঘটায় তাহার ব্যর্থ পরিণাম কালিদাস যেমন দেখাইয়াছেন বিদ্যাপতিও ঠিক তেমনি দেখাইয়াছেন। মদন যে মিলন ঘটাইল সে মিলন বিরহের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, যে মিলন রাধিকার আত্মপ্রস্তুতির ভিতর দিয়া সংঘটিত হইয়াছে সেই মিলন হইল সার্থক। তখনই তিনি বলিলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।

অস্থিরতা বিসর্জন দিয়া, রূপগর্ব ভুলিয়া গিয়া, ভোগ-বাসনার অতীত হইয়া যখন রাধিকা প্রেম-স্বরূপের কাছে আসিলেন তখন তিনি পরিপূর্ণ প্রেম উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন তিনি প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যাও করিলেন—

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়।

চণ্ডীদাসের পদে রাধিকা যেমন symbol, বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ তেমনি symbol : তিনি পরিপূর্ণ প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক। রাধিকা প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক ; ইহার স্বরূপ-রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করিতে চান। কিন্তু সোজাপথে না গিয়া তিনি ধরিয়াছিলেন বাঁকাপথ ; দুঃখের দহনও হইয়াছিল তেমনি তীব্র। কিন্তু পরিশেষে গন্তব্যস্থলে তিনি পৌঁছিয়াছেন। পরিপূর্ণ প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া রাধিকা-চরিত্র আবর্তিত হইয়াছে, যেমন হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা-চরিত্র। বিদ্যাপতির রাধিকা এবং রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনা উভয়ে একই সুরে বাঁধা। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও অনেক। উভয়েরই প্রথম অগ্রসর ভুল পথে, তাহার ফলে দুঃখ-বিরহের ভিতর দিয়া প্রায়শ্চিত্ত। পরিণতিতে দুইজনেই আবার পথের সন্ধান পাইয়াছেন। বিদ্যাপতির গীতিনাট্যে এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' সাংকেতিক নাটকেও দেখি কয়েকটি চরিত্র অপরিবর্তনীয়— বিদ্যাপতির কৃষ্ণ এবং দূতি-সম্প্রদায়, 'রাজা'র রাজা এবং ঠাকুরদা সুরঙ্গমা। তবে বিদ্যাপতির কৃষ্ণ-চরিত্রে যে সামান্য অবস্থা-পরিবর্তন আছে, তাহা প্রকৃত পরিবর্তন নয়, প্রচলিত ধারার প্রতি আনুগত্য।

বিদ্যাপতির রাধিকাকে 'সর্বকারণকারণম্' কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির রূপে না দেখিয়া সাধারণ প্রেম-সৌন্দর্যোপাসক নায়িকারূপে দেখাই সংগত। এ রাধিকার মিল ও সংগতি রহিয়াছে কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনার সঙ্গে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের গোপীদের সঙ্গে নয়। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের নায়িকা শকুন্তলার প্রেমের বিভিন্ন পর্বগুলি বিচার করিলে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাধিকার প্রেমের স্তরের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে, শকুন্তলা হয়তো ঋষিকন্যা আশ্রম-বাসিনী বলিয়া রাধিকার মত অতখানি চটুল ও উগ্রচঞ্চল হইয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু মূল সুরটি এক। তাহা ছাড়া বিদ্যাপতির সমগ্র রচনা বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-মহাজন ছিলেন না। রাধিকার প্রেমলীলার মধ্যে যে একটা চমৎকার রোমান্টিক কাব্যের সম্ভাবনা আছে সেইটুকুই তাঁহার কবিদৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই তাঁহার কাব্যের সুর আর বৈষ্ণব কাব্যের সুর এক নয়। তাঁহার সমগ্র পদাবলীর মধ্যে যে সুরটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে, ভোগের আসক্তি দিয়া প্রেম-সৌন্দর্যকে আবৃত করিয়া দেখিলে পরিণামে তাহা দুঃখের কারণ হয় ; প্রেম দেহের নয় মনের, ভোগের নয় ভোগাতীতের। প্রেম সম্পর্কে কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই এক সুর। আশা করা যায় বৈষ্ণব-কাব্য বা পদাবলীর সুর ইহা নয়।

৬

বিদ্যাপতির পদাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যিক আস্বাদন আজিও হয় নাই। বিদ্যাপতি কত বড় কবি তাহার অনেকখানিই এখন আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহা ছাড়া

বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠির মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া তাঁহার কবি-স্বরূপের অন্যান্য দিককে একেবারে উপেক্ষা করা হইয়াছে। আর কবি হিসাবে তাঁহার যে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাহাও সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লোপ করা হইয়াছে। বিদ্যাপতিকে কোনো গোষ্ঠিভুক্ত না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা উচিত। আর এ আলোচনায় কোনো পূর্বসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া, কোনো সুপ্রচলিত পন্থার অনুবর্তন না করিয়া আধুনিক বিশ্লেষণপ্রধান (analytical) সমালোচনা-পদ্ধতির অনুসরণে বিদ্যাপতির কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা দরকার। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা ও আস্বাদন কেবল ভক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, সমালোচনা আবেগ-উচ্ছ্বাসপ্রধান নয় বুদ্ধি-যুক্তিপ্রধান।

এই প্রকার আলোচনার পূর্বে প্রয়োজন বিদ্যাপতির সমগ্র রচনার একখানি নির্ভরযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ। এ যুগে বিদ্যাপতির পদাবলী আলোচনাপ্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা জটিল বাধা তাঁহার পদের কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতা নির্ধারণ করা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যাপতির নামে যেসমস্ত পদ চলিতেছে তাহার প্রত্যেকটি মিথিলানিবাসী মহারাজ শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচনা নয়, বহু বাঙালী কবির পদ উহার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। আর এইসঙ্গে আরও একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিদ্যাপতি নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। মোট কথা, বিদ্যাপতি-সমস্যা চণ্ডীদাস-সমস্যার চেয়ে কম জটিল নয়। প্রথমে এই গ্রন্থিসংকুল জটিলতাকে সরল করিয়া কোন্ পদগুলি মৈথিলী বিদ্যাপতি রচিত তাহা ঠিক করিয়া সেই অনুপাতে তাঁহার যেটুকু কবি-কৃতিত্ব সেইটুকুই তাঁহাকে দেওয়া উচিত। নতুবা এই বিদ্যাপতি-আবর্তে পড়িয়া অনেক বাঙালী কবির কবিত্ব খর্ব হইয়াছে এবং হইতেছে।[১]

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কোনো ব্যাপক আলোচনাকে কেবল রসের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। কবিকে নিয়া যেমন বিদ্যাপতি-সমস্যা, কবির ভাষা নিয়া অনুরূপ ভাষা-সমস্যা আছে। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাও অপরিহার্য। বিদ্যাপতির ভাষা-রহস্যের গ্রন্থিমোচন করিতে পারিলে আপনা হইতেই ব্রজবুলি-রহস্যেরও গ্রন্থিমোচন হইবে। বিদ্যাপতি বিভিন্ন রসের কাব্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীর ভাষা খাঁটি মৈথিল নয়, মৈথিলীর আধারে সৃষ্ট বিদ্যাপতির নিজস্ব একটি ভাষা। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের উপযোগী বলিয়াই তিনি এইভাবে ভাষাকে কৃত্রিম ও সাহিত্যিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের ব্রজবুলি বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের বিকৃত অনুকরণজাত নয়, ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে বিদ্যাপতির মধ্যে। বলা যায়, বিদ্যাপতিই এই ভাষার বীজ রোপন করিলেন।

ভাষা সম্বন্ধে কবির নিজস্ব একটি দৃষ্টি ছিল—

বাল-চন্দ বিজ্জাবই ভাসা।
দুহু ন হি লগ্গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেসর হর শির সোহই।
ঈ নিচ্চই নাঅরমন মোহই।
দেসিল বঅনা সবজন মিঠ্ঠা।
তেঁ তেসম জম্পঞো অবহট্টা॥

১ এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেনের 'বিদ্যাপতি-গোষ্ঠি' (বর্ধমান সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

কীর্তিলতায় অবহট্ট ভাষা প্রয়োগের জন্য কবির এই চমৎকার কাব্যিক কৈফিয়ত। এই উক্তি কাব্যভাষা সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট বৈদগ্ধ্যই প্রমাণ করে।

বিদ্যাপতির ভাষার সঙ্গেই আর-একটি বিষয়ের আলোচনা হওয়া দরকার—বিদ্যাপতির উপমা। ভারতীয় সাহিত্যে 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত। বিদ্যাপতির উপমাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাঁহার উপমাগুলিও কাব্যসৌন্দর্যে ন্যূন নয়। এই উপমাগুলির অনেকগুলি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লুণ্ঠিত, অনেকগুলি তাঁহার নিজস্ব।

বিশেষ অর্থে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে উপমার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক অর্থে প্রায় যাবতীয় অর্থালংকারই উপমার পর্যায়ে পড়ে। একটু ব্যাপক অর্থে উপমার নামকরণ করা যায় চিত্র-কৌশল। ইহার সংজ্ঞা মোটামুটি এই— রস নিজেকে মূর্ত করিতে যাইয়া রূপসৃষ্টির পথে শব্দঝংকার এবং চিত্রসম্পদের আশ্রয় নেয়; শব্দঝংকারের নাম শব্দালংকার ও ছন্দোবিজ্ঞান, আর চিত্রসম্পদের নাম অর্থালংকার। বিদ্যাপতির উপমা-বিচারে অর্থালংকারের নাম করা উচিত চিত্র-কৌশল।

বিদ্যাপতির চিত্রগুলি দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর চিত্র আছে, বর্ণনীয় বিষয়কে সেই চিত্রগুলির সাহায্যে পরিস্ফুট করা হয়। এই শ্রেণীর চিত্রে দুইটি জিনিস থাকে, একটি প্রস্তুত আর-একটি অপ্রস্তুত। যেমন ধরা যাক, 'মেঘমালা সয়ঁ তড়িত লতা জনি'; রাধিকার চঞ্চলতা প্রস্তুত বিষয়, ইহাকে পরিস্ফুট করা হইতেছে অপ্রস্তুত তড়িৎ-রেখার সাহায্যে। এই তড়িৎ-রেখা যেমন প্রস্তুত বিষয়কে পরিস্ফুট করিতেছে তেমনি একটি চিত্রের আভাসও দিতেছে। অবশ্য প্রত্যেক অপ্রস্তুত বিষয়ই যে চিত্রের আভাস দিবে এমন নিয়ম নাই। অপ্রস্তুত চিত্রও হইতে পারে বস্তুও হইতে পারে।

অর-এক শ্রেণীর চিত্র আছে যাহাতে প্রস্তুত-অপ্রস্তুত নাই। যেমন—

মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল ঢর নীরে॥
উর পর সামরি বেণী।
কমল কোস জনি করি নাগিনী॥
কেও সখি তাকএ নিসাসে।
কেও নলিনী দলে কর বাতাসে॥

এক শ্রেণীতে ভাবব্যঞ্জনা ও অর্থগভীরতা। আর একশ্রেণীতে বর্ণনার স্বাভাবিকতা ও মাধুর্য। শেষোক্ত শ্রেণীর ইংরাজী নাম Image।

চিত্র বা শব্দঝংকার—ইহারা কাব্যের অলংকার বটে, কিন্তু কাব্যের আত্মভূত অলংকার। এই সংস্কৃত শ্লোকটিতে সে কথা চমৎকার ভাবে বলা হইয়াছে।—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্ত্য সোঽলঙ্কার ধ্বনৌ মতঃ॥

রস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যাহার রচনা সম্ভবপর হয়, রসের সহিত একই প্রযত্নে যাহা সিদ্ধ হয় তাহাই অলংকার। বিদ্যাপতির চিত্রগুলি বিচার প্রসঙ্গে দেখিতে হইবে যে তাহার চিত্রগুলি কাব্যের বহিরঙ্গ মূলক সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়াছে, না, কাব্যাত্মার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাব্যের আত্মা অলংকারের সহিত কেমন

গভীরভাবে অন্বিত হইতে পারে কালিদাসের কাব্যে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে।[১]

কাব্যে চিত্রসৃষ্টি করে রূপ, আর সংগীত ব্যঞ্জনা দেয় অরূপের। উভয়ের লক্ষ্য এক চিত্তে রম্যার্থ-প্রতিপাদন। সাধারণত দেখা যায়, যে কবি রূপমোহে আবিষ্ট তাহার অবলম্বন চিত্র; আর যাহার কাব্যে অরূপের বাণীই প্রবল তাহার আশ্রয় সংগীত। কালিদাস-কীট্‌স্-বিদ্যাপতি চিত্ররীতির কবি; শেলী-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-চণ্ডীদাস সাংগীতিক কবি। প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় কোথায়ও চিত্র কোথায়ও সংগীত। চিত্ররীতি বিশেষভাবে বস্তুলীন (objective); সাংগীতিক রীতি অনেকখানি আত্মলীন (subjective); চিত্রের ভিতর দিয়া শুধু রূপটাই ধরিয়া দেওয়া যায়, আত্মগত অনুভূতি প্রকাশ করিবার অবকাশ সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু সাংগীতিক রীতিতে বস্তু নয় ভাব লইয়া কারবার। অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা পরিস্ফুরণের অবকাশ সেখানে বেশি। এই জন্য চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ যতখানি বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের পদাবলীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততখানি নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বিদ্যাপতি প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ের কবিতায় চিত্ররীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিরহ ভাবসম্মিলনে যেখানে রূপের জগৎ ছাড়াইয়া অরূপের রাজ্যে আসিয়াছেন সেখানে তিনি চিত্র ছাড়িয়া সংগীতেরই আশ্রয় লইয়াছেন। বিরহের দুই-একটি চিত্ররীতির পদ থাকিলেও ভাবসম্মিলনের প্রত্যেকটি পদই সাংগীতিক রীতিতে লিখিত। আবার এই চিত্রগুলিরও একটা ক্রমবিবর্তন আছে। এই বিবর্তন রাধিকা-চরিত্র বিকাশের অনুসারী। পূর্বরাগ-মিলন-মান প্রভৃতিতে যে চিত্র বা উপমা আছে সেগুলি নিতান্ত লৌকিক বা প্রাকৃত। প্রেমকে সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণকে কলুর বলদের সঙ্গে এবং যুবতী নারীর কুলধর্মকে কাঁচের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

এইসকল চিত্র এবং উপমায় অধ্যাত্ম ভাববিশুদ্ধি নাই। হয়তো ইহা বিদ্যাপতির উপর রাজ-প্রতিবেশ-প্রভাব সূচিত করে। কিন্তু ক্রমশঃ শেষের দিকে দেখা যায় যে, চিত্রগুলির প্রকার পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির উপমা-চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিবার সঙ্গেসঙ্গে এইগুলির ক্রমবিবর্তনের ধারাটিও অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহার ফলে এই আলোচনার মধ্যে রাধিকার মানস-বিবর্তনের যে ধারাটির প্রতি ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেই ধারাটি সুস্পষ্ট হইতে পারে।

১ এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত 'উপমা-কালিদাসস্য' গ্রন্থখানিতে; এবং রবীন্দ্রনাথের উপমা সম্বন্ধে প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'প্রবন্ধসংগ্রহ') দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-জীবনী ১।২।৩। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। মূল্য যথাক্রমে সাড়ে আট টাকা, দশ টাকা, দশ টাকা।

কবিকথা। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সুপ্রকাশন। সাড়ে তিন টাকা।

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। সাড়ে চার টাকা।

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ ১।২। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং ; মিত্রালয়। মূল্য যথাক্রমে সাড়ে তিন ও চার টাকা।

রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ ১।২। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। মিত্রালয়। মূল্য চার টাকা ও সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। তিন টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা ১ম খণ্ড। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। দি বুক হাউস। বারো টাকা।

কবিগুরু। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস। তিন টাকা বারো আনা।

রবীন্দ্রদর্শন। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং লিঃ। দুই টাকা।

জনগণের রবীন্দ্রনাথ। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। সিগনেট প্রেস। আড়াই টাকা।

কিছুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠক ও লেখকদের মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে, এতগুলি বই কাছাকাছি প্রকাশিত হওয়া তারই অন্যতম প্রমাণ। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক ও লেখকের মন সব সময়েই উৎসুক হয়ে থাকবে, এ কথা মোটেই আশ্চর্য নয়। তবু অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিকের চিন্তা-ভাবনা আচ্ছন্ন করে যাঁর রচনা প্রসারিত ছিল, আমাদের ভাষা ছন্দ কবিতা নাটক গান উপন্যাস ছোটগল্প, এমনকি সামাজিক চালচলন শিষ্টাচার সুমিতিবোধ হতে শুরু করে রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রত্যেক দিকে যাঁর ভাবরস আমাদের সর্বদা পুষ্ট করেছে, মরজগতে তাঁর অনুপস্থিত ঘটবার পরই এই বিরাট বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে সবিশেষ আলোচনা হবে, এ খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রপ্রতিভা এতই বিরাট যে তার সামগ্রিক ও সর্বদিকব্যাপী অখণ্ড আলোচনা করতে হলে আর-একজন রবীন্দ্রনাথেরই দরকার। সেইজন্য আলোচ্য গ্রন্থগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রপ্রতিভার এক-একটি দিক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝতে হলে রবীন্দ্রজীবন জানা এবং আলোচনা করাও অপরিহার্য। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বতোভাবে কবি, তাঁর কবিতায় সুন্দরের উপাসনা জীবনে সুন্দরের উপাসনা থেকে পৃথক্ হয় নি। আলোচ্য বইগুলিকে সেইজন্য প্রথমেই দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : রবীন্দ্রজীবন সম্বন্ধে আলোচনা এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ; যদিচ ও-দুটির মধ্যে কঠিন ভেদরেখা কখনোই টানা চলে না।

প্রথম রবীন্দ্রজীবন সংক্রান্ত বইগুলির উল্লেখ করি। গোড়াতেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থের। এর তৃতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডে কবির জন্মকাল থেকে ১৩০৮ সাল, অর্থাৎ কথা ও কাহিনী এবং ক্ষণিকার যুগ পর্যন্ত আলোচনা আছে ; দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩০৮

সাল থেকে ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) সাল পর্যন্ত; তৃতীয় খণ্ডে ১৩২৫ সাল হতে ১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) সাল পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি তখন কবি সম্বন্ধে কিই-বা তথ্য জানা ছিল।· ·তার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষীয়েরা কবির জীবনী সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও উপকরণ লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন।" সেইসমস্ত তথ্য ও উপকরণই এই সংস্করণে এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু জানতে চান বা যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে বা আলোচনা করতে চান তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমূল্য। কবির দৈনন্দিন জীবন, তার খুঁটিনাটি কথা, কোন্ ঘটনা কবির মনে কেমন ছায়াপাত করেছে, কোন্ কোন্ দেশে কবি গিয়েছিলেন, কি পরিবেশের মধ্যে কি কাব্য রচিত হয়েছিল— এইসমস্ত বিষয়েই রবীন্দ্রজীবনের একটি সাবলীল বর্ণাঢ্য অথচ তথ্যনিষ্ঠ চিত্র বইটিতে পরিস্ফুট। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ হয়েছে, তখনও সবুজ পত্রের যুগ চলেছে, সেই সময় এই তৃতীয় খণ্ডের শুরু। কবির কয়েকবার য়ুরোপ-ভ্রমণ, আমেরিকা-গমন, সিংহল মালয় চীন জাপান দক্ষিণ-আমেরিকায় গমন, যবদ্বীপ শ্যাম ও বৃহত্তর ভারতের অন্যান্য অংশ পর্যটন, তাছাড়া রুশিয়া ও পারস্য ভ্রমণের বর্ণনা এই খণ্ডটিতে আছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব— এরই মধ্যে রচিত হয়েছে শিশু ভোলানাথ, মুক্তধারা থেকে শুরু করে চার অধ্যায় পর্যন্ত গ্রন্থগুলি। তাছাড়া এই যুগের মধ্যে কবিজীবনের কতকগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, বিশ্বভারতী-স্থাপনা, পরে শ্রীনিকেতনেরও সূচনা। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে কবির যোগ ঘন ও নিবিড় হয়ে উঠল। অন্যদিকে, এই যুগের মধ্যেই চিত্রকররূপে তাঁর আবির্ভাব হল, নৃত্যকলার পরীক্ষা হল শুরু। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাওলাট আইনের প্রতিক্রিয়া, রবীন্দ্রনাথের নাইট-উপাধি-ত্যাগ, তার পরে সত্যাগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক, 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক প্রবন্ধ, পুনা-চুক্তি— সংক্ষেপে মণ্টেগু-আইনের শুরু থেকে ১৯৩৫ সালের নূতন ভারতশাসন আইনের পূর্ব পর্যন্ত সারা যুগটিতে রবীন্দ্র-মানসের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কবিপ্রতিভার দীপ্ত মধ্যাহ্নের কাহিনী আছে এই খণ্ডটিতে। এইরকম পরিশ্রম ও যত্নের সঙ্গে রবীন্দ্রজীবন বর্ণনা করার জন্য গ্রন্থকার সমগ্র বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র করের কবিকথা রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা বটে, কিন্তু ও ধরনের জীবনকথা নয়। ধারাবাহিক জীবনী লেখবার প্রয়াস এতে নেই, এ হল মানুষ রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত ঘরোয়া জীবনযাত্রার টুকিটাকি নানা কাহিনীর সুমধুর ও স্বচ্ছন্দ বর্ণনা। লেখক বহুকাল রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তার স্বীকৃতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন এবং বইটিতে তা ছাপাও আছে। সেই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মধ্যে সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার নানা বিচিত্র ছোট ছোট কাহিনী এ বইটিতে সংগৃহীত। মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, রূপে প্রতিভায় ব্যক্তিত্বে চোখ-ধাঁধানো রবীন্দ্রনাথ— কবির এই বিশ্ববিজয়ী মূর্তির আড়ালে একটি সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছবি অপরূপ হয়ে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ কিরকম মুঠো মুঠো বায়োকেমিক ঔষধ খেতেন অনবরত, দু-চার দিন পর পরই বাড়ি বদলাবার ধুম উঠত, একবার খুব সাদাসিধে জীবনযাত্রার উদ্দেশ্যে বিছানায় কম্বল জানলায় কম্বলের পর্দা, ঘরময় কম্বল লাগিয়ে শেষকালে ছারপোকার উৎপাতেই হোক্ কম্বলের রোঁয়াতেই হোক্ একেবরে অস্থির কাণ্ড, শেষপর্যন্ত কবিকে প্রায় স্নানই করতে হল ফ্লিট্ দিয়ে— এইরকম নানা ঘটনার উল্লেখ আছে বইটিতে। তাছাড়া অপরাধী কেমন

সহজে মার্জনা পেত কবির ক্যছে, কাউকে পীড়া দিতে কবির চিত্ত সহজেই বিমুখ ছিল, কবির কেমন আসর বসত, এসবেরও ছবি বইটিতে আছে।

রবীন্দ্রজীবনী লেখার চেয়ে রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনা করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার আবার সমালোচনা করা তার চেয়েও অনেক দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ আজকালকার যুগে। বাস্তবিক-পক্ষে সমালোচনার সূত্র কি, এই নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করতে গেলে সমালোচক তার এক-একটি দিক, যেমন, ভাষা আঙ্গিক ইত্যাদিতেই আটকে যেতে পারেন; এবং এইরকম বিশিষ্ট দিক-আশ্রয়ী আলোচনার প্রয়োজনও কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রমানসের ব্যাপকতর আলোচনা করবেন তাঁদের কাছে পাঠক স্বতঃই আশা করবেন যে তাঁরা আলোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানসের মূল সুরটি ধরিয়ে দেবেন; অথবা, রবীন্দ্রমানস কি বৈচিত্র্যের সঙ্গে আলোচ্য বস্তুর মধ্যে কি বিচিত্রভাবে বিকশিত হচ্ছে সেই কথাটি ফুটিয়ে তুলবেন। শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের হাতে পড়লে এই সমালোচনাই নতুন এবং অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়; যেমন রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালিদাসের সমালোচনা। কিন্তু ও-পর্যায়ের সমালোচনার কথা ছেড়েই দিলাম, ওগুলি ক্বচিৎ মেলে। সাধারণক্ষেত্রে একজন কবির মূল কথাটা কি, সেটা তাঁর কাব্যে কি বিচিত্রভাবে ফুটল, সেটা কেন আমার ভালো লাগল— পাঠকদের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার যাচাই করা সমালোচনার অন্যতম পদ্ধতি। কিন্তু কালক্রমে সমালোচনার আদর্শও বদল হতে চলেছে। এককালে এলিয়ট্ প্রমুখ সমালোচকেরা কবি বা সমালোচকের ব্যক্তিচিত্তকে প্রায় অস্বীকার করে একধরনের বিচিত্র নৈর্ব্যক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আজকাল দাবি দাঁড়িয়েছে এই যে, কোনো রচনা শুধু ভালো হলেই হবে না, প্রচলিত সামাজিক আদর্শে ভালো হতে হবে। কবি, সার্থক কবি, কখনই 'অ-সামাজিক' হতে পারেন না, তাতে তাঁর কবিধর্মই ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু যে-যুগে লঘু সামাজিকতা প্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে সে-যুগে কাব্যাদর্শ রক্ষিত হল কি না, সে কথা আলোচনার বদলে সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হল কি না তাই নিয়েই সমালোচনা উন্মত্ত কলরবে আবর্তিত হতে থাকে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি কি না এ নিয়ে সময় সময় তর্ক দেখা যেত না।

আলোচ্য সমালোচনা-গ্রন্থগুলির লেখকেরা খুব স্পষ্টভাষায় এ নিয়ে তর্ক না করলেও তাঁদের মনে এসব চিন্তা যে কিছু কিছু ছায়াপাত করেছে তা তাঁদের আলোচনার বিভিন্ন ভঙ্গী থেকে বোঝা যায়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রন্থের। রবীন্দ্রকাব্যে বলাকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বলাকার রচনাকাল হল সবুজপত্রের যুগ, সে সময় রবীন্দ্রমানসে একটি বিরাট পালাবদল হচ্ছিল, একটা বিরাট বন্ধনমুক্তির সূচনা দেখা দিয়েছে। কবির কথায়, "তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল · আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।" বলাকা এই পটভূমিতে রচিত। শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন সেই পটভূমির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বইয়ে। বিভিন্ন সময়ে কবি নিজেই বলাকার কবিতাগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাঁর কিছু কিছু অনুলিখন শ্রীযুত প্রদ্যোতকুমার সেন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন। তাছাড়া এইরকম শ্রুতিলিখিত ও প্রকাশিত ব্যাখ্যা ছাড়াও

শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন কবির সঙ্গে নানা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এবিষয়ে যা জানবার সুযোগলাভ করেছিলেন সে সবগুলি একত্র করে এই পরিক্রমা প্রকাশ করেছেন। তিনি কবিকে যেসব গাথা ও দোঁহা দিয়েছিলেন সেগুলিও গ্রন্থের প্রথম দিকে বলাকা-কাব্যের ইতিহাস উপলক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে। কোন্ কবিতাটি কোন্খানে কি অবস্থায় রচিত তারও বর্ণনা আছে 'বলাকার জন্মকথা' নামক অধ্যায়ে। 'ছন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে বলাকার ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু স্বকৃত আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে, তার পরে আছে প্রত্যেকটি কবিতার আলাদা ব্যাখ্যা। জীবন-দর্শন, ছন্দের স্বরূপ, গতিবেগ, বন্ধনমুক্তির আকুলতা ইত্যাদি বিষয়ে কবির অজস্র উক্তি এই বইটিতে ছড়ানো আছে, যার বহু অংশ সম্ভবতঃ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থখানি প্রচলিত অর্থে সমালোচনা নয়, এ হল পরিক্রমা; অর্থাৎ সমালোচকের নিজের কথার চেয়ে প্রধানতঃ লেখকের উক্তিরই বিন্যাস, যদিচ, সমালোচকের নিজের কথাও অনেকখানি এর মধ্যে আছে।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর গ্রন্থগুলি অসীম অধ্যবসায়ের ফল। তিনি সুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন, আবার বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্ররচনার সেই অংশের প্রায় প্রত্যেকটি বই বা প্রত্যেকটি কবিতার আলোচনা আছে। তাঁর রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর কবির বাল্যকালের রচনার আলোচনা, যে সময় কবির ভাষায় তাঁর কাব্যভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে মাত্র। বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও শৈশবসঙ্গীত প্রভৃতি কাব্য এ বইটিতে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্ররচনার এই অংশগুলি স্বল্প-পঠিত এবং স্বল্প-আলোচিত, কবিও এগুলির প্রতি পরে আর কৃপাদৃষ্টি দেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার পক্ষে এগুলির মূল্য কম নয়, এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম স্ফুরণের চকিত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও ধন্যবাদার্হ তাঁর অতি সুন্দর ভূমিকাটির জন্য। এ সময় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কেমন ছিল, সমাজের চেহারাটা কিরকম ছিল, ভূমিকাটিতে তার সুনিপুণ সাহিত্যিক আলোচনা আছে। লেখক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে বলেছেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এমন-এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর।" রচনার মধ্যে, বিশেষতঃ অন্য বইগুলিতে, অবশ্য লেখক কেবল সামাজিকতার মানদণ্ডে সাহিত্যবিচারের কোনো চেষ্টা করেন নি, নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহের প্রথম খণ্ড অনেকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে গীতিনাট্য কাব্যনাট্য নৃত্যনাট্য ঋতুনাট্য ঋতুচক্র প্রভৃতি বিষয় আলোচিত; দ্বিতীয় খণ্ডে তত্ত্বনাট্যগুলির আলোচনা করা হয়েছে, যথা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, ইত্যাদি। লেখকের মতে এইসব রচনার মূল কথা হল তত্ত্ব। কাহিনী পুরোভাগে স্থাপিত হলেও তার প্রাধান্য নেই, কাহিনীর পিছনের তত্ত্বটিই মুখ্য। এই তত্ত্বনাট্যগুলির তিনটি পর্ব আছে, যথা, প্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ; দ্বিতীয় পর্বে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা ও ডাকঘর; তৃতীয় পর্বে ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি, তাসের দেশ এবং কবির দীক্ষা। লেখকের মতে, প্রকৃতির প্রতিশোধ পরবর্তীকালের তত্ত্বনাট্যসমূহের পূর্বাভাস। দ্বিতীয় পর্বে কবির জীবনে সহজবোধ্য শিল্পের যুগ চলে গিয়েছে। তৃতীয় পর্বের সাধারণ লক্ষণ হল "এ সময়কার নাটকগুলি মাত্র নয়, কাব্য উপন্যাস

প্রভৃতি প্রায় সমুদয় শ্রেণীর রচনাই তত্ত্বভারাক্রান্ত এবং সেই কারণেই অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মশরীরী হইয়া উঠিয়াছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, নাটকে ব্যতিক্রম নটীর পূজা, উপন্যাসে ব্যতিক্রম যোগাযোগ। সচেতন তত্ত্বশিল্পের স্পর্শ ইহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই, পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে এ দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু এই জাতীয় ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে, এই পর্বের প্রায় সমস্ত রচনাই তত্ত্বপ্রকাশকেই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।" এই তত্ত্বনাট্যগুলির সমস্যা ত্রিবিধ: মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। প্রথমটির উদাহরণ প্রকৃতির প্রতিশোধ, দ্বিতীয়টির উদাহরণ শারদোৎসব প্রভৃতি, তৃতীয়টির উদাহরণ অচলায়তন। এইরকম পর্ব ভাগ করা ছাড়াও বিশী মহাশয় আরও প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে এই নাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা 'অ-ভারতীয়' নয়, কারণ এগুলির মধ্যে সর্বত্রই বিষয়বস্তু ও মনোভঙ্গী সনাতন ভারতীয় ধারা হতে বিচ্যুত নয়, এমন কি আঙ্গিকও। অবশ্য তাঁর মতে অচলায়তনের অধিকাংশ চরিত্রই "রক্তাল্পতা-ব্যাধিগ্রস্ত, ছায়াপ্রায়, আইডিয়ার মুখোশমাত্র।"

বিশী মহাশয়ের রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের প্রথম খণ্ডটিতে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে নৈবেদ্য পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডটিতে বলাকা পর্যন্ত। তাছাড়া শেলি কীট্‌স ও কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনাও আছে। উপসংহারে লেখক রবীন্দ্রকাব্যে অতিকথন ও সামান্যকথন-দোষের আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ লেখক বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম মানবমুখিতা। এইখানেই কালিদাসের সঙ্গে বা য়ুরোপীয় মনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা, কারণ পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমুখী আর ভারতীয় সাহিত্য— অবশ্য কালিদাস তার অন্যতম ব্যতিক্রম— প্রধানতঃ ভগবদ্‌মুখী। কিন্তু লেখকের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, মানবমুখিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান ধর্ম হলেও তাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাতে কবি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষত্রুটিবহুল মানুষের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করতে পারেন নি। বারে বারে কবি মানুষের দ্বারে করাঘাত করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নি। তৃতীয়তঃ, "রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার এই ট্র্যাজেডি"র হাত এড়াতে গিয়ে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "প্রকৃতি মানুষের বিকল্প" হয়ে দাঁড়িয়েছে, রবীন্দ্রনাথ "প্রকৃতিপ্রীতির মধ্যে মানবপ্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন।"

বিশী মহাশয়ের আলোচনায় আভিধানিক বিস্তার আছে, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আছে, তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয়ও আছে, বক্তব্যের দুঃসাহস আছে, প্রয়োজনবোধে অপ্রিয় সমালোচনা করতেও কুণ্ঠা নেই। যেমন, প্রকৃতিপ্রীতি মানবপ্রীতির বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথাটা অসাধারণ সন্দেহ নেই, বলতে সাহস লাগে। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে এইসব সিদ্ধান্তের কতকগুলি যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই লিখতে হয়। সংক্ষেপে বলা চলে, রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতি যত বড় স্থানই অধিকার করে থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথ রক্তমাংসের মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পেরে প্রকৃতিপ্রীতির দ্বারা সেই অভাব মিটিয়েছেন এ কথা কি বলা চলে? অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথও কি নিজের জ্বলন্ত ব্যক্তিসত্তাকে স্তিমিত রেখে দোষত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি, যেখানে মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনাই কখনো শান্তভাবে কখনো তীব্র তীক্ষ্ণভাবে তরঙ্গিত হচ্ছে? তাছাড়া, যোগাযোগ কি রবীন্দ্রসাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন? বহু

খ্যাতনামা সমালোচকের মতে যোগাযোগ একটি মহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার অসাফল্যের স্বীকৃতি। আমার তো মনে হয়, যোগাযোগ রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে 'অ-রাবীন্দ্রিক' রচনার অন্যতম- তো বটেই, গল্পগুচ্ছের 'শাস্তি' গল্পটি ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে একহিসেবে হয়তো সবচেয়ে নিষ্ঠুর রচনাও। কিন্তু এমনি সাধারণ সাহিত্য বিচারেও গল্পটি কাটাছেঁড়া, অস্বাভাবিক ও স্বল্পকৌশলী রয়ে গেছে— সুবৃহৎ বিস্তার সত্ত্বেও গল্প দানা বাঁধে নি। নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক একজায়গায় বলছেন, প্রকৃতির প্রতিশোধ পড়বার সময় "মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিবার আগে রবীন্দ্রনাথ কি ফাউস্ট পড়িয়াছিলেন? আমার বিশ্বাস, নাটকখানি লিখিবার আগে ফাউস্ট পড়িবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ফাউস্ট পড়ে অথবা না পড়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখেছিলেন কি না এই অনুসন্ধান সাহিত্যবিচারে অত্যাবশ্যক তো নয়ই, সম্ভবতঃ অবান্তর— প্রসঙ্গান্তরে বিশী মহাশয়ও সে কথা স্বীকার করেছেন। অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও এইসব প্রশ্ন, এমনকি সাহিত্যবিচারের মূল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তর্কের বীজও বইগুলির মধ্যে রয়ে যায়।

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা ঠিক একই ধরনের বা একই দরের বই না হলেও নিঃসন্দেহে একই মেজাজের বই। অর্থাৎ লেখক সিদ্ধান্ত যা-ই করুন না কেন, সে-বিষয়ে পার্থক্য থাকুক না কেন, সাহিত্যের দিকে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটা সমগোত্রীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমার আলোচ্য প্রথম খণ্ডটি কেবল রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা। ভূমিকায় লেখক বলছেন, "বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র তীর্থমণ্ডলের পথে পথে আমার দৃষ্টিতে যে দৃশ্য, যে বৈশিষ্ট্য, যে রহস্য ও যে বিস্ময় ধরা পড়িয়াছে, তাহাই অকপটে ব্যক্ত হইয়াছে গভীর আনন্দের সঙ্গে।" এই হল প্রথম উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে লেখক আরও বলছেন, "রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে কবিতার পূর্ণ অর্থবোধই সাধারণ পাঠকের রসোপলব্ধির মূল ভিত্তি। আভাস বা ইঙ্গিত রসিক ও বিদগ্ধজনের পক্ষে পর্যাপ্ত, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-সঙ্কেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুস্তকে তিন শতাধিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাবধারার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" এইখানেই তো একটা বড় প্রশ্ন উঠে পড়ে। অস্পষ্টতার অভিযোগের সম্মুখীন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও বহুবার হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সেই ভয়ে সরলার্থ করবার চেষ্টা করেন নি। অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। যেখানে রস ধ্বনি- বা ব্যঞ্জনা-সম্ভূত সেখানে সেই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা উপভোগের ক্ষমতা না থাকলে শুধু ব্যাখ্যা দ্বারা রস উপলব্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু বইটির দোষদর্শনের জন্য এ কথাটার উল্লেখ করছি না। বরং যেখানে যেখানে লেখক এরকম ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে সে ব্যাখ্যাগুলি সাধারণতঃ রসোত্তীর্ণই হয়েছে এবং রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরটিকে উদ্‌ঘাটন করবার সহায়ক হয়েছে। বইটির আগাগোড়া ভাষার প্রসাদ ও চিত্তের আনন্দিত প্রসন্নতা আছে, যা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একেবারে অন্যধরনের সমালোচক, তিনি এসবের ধারে কাছে ঘেঁষেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য হল একটা সূত্র আবিষ্কার, যে সূত্রের বাঁধনে সমস্ত রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা। তিনি এইরকম একটা সূত্র আবিষ্কারও করে ফেলেছেন, সেটা হল ভাব থেকে মহাভাব এবং মহাভাব থেকে আবার ভাবাভাবে বিবর্তন। একটা ভাব থেকে বিবর্তন শুরু হয়ে মহাভাবে উপস্থিত হয়, সেটা ক্রমে ভাবাভাবে পরিণত হয়। আবার সেই ভাবাভাবই একটা নতুন ভাব হিসেবে গণ্য হয়, সেখান থেকে আবার এক নতুন পালার

মহাভাব ও ভাবাভাব চলতে থাকে। এইরকম চক্র অবিরাম চলছে— এই সূত্রেই সমস্ত রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা। বলা বাহুল্য, কোনো সার্থক কাব্যকেই এরকম সূত্রের খাঁচায় আটকানো যায় না, রবীন্দ্রকাব্য তো আরও নয়।

কাব্যের মধ্যে দর্শনের সূত্র আবিষ্কার কববার চেষ্টার এই বিপদ থাকলেও শ্রীযুত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রদর্শন এই দোষ থেকে মুক্ত। কারণ, তার মধ্যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাব্যকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাই আছে, সূত্র বেঁধে দেবার চেষ্টা নেই। আর এ কথাও নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এই সফলতার প্রধানতম কারণ হল যে লেখক প্রথমেই মেনে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ হলেন কবি, তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা করতে হলে দার্শনিকের উচ্চ আসন থেকে মাপবার যন্ত্র নিয়ে এগোলে চলে না, কাব্যে ডুব দিতে হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি রবীন্দ্রদর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদের বাণী কি ভাবে রবীন্দ্রমানসে ছায়াপাত করল, বিশ্বমানবের সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ হতে উচ্চারিত 'অমৃতের পুত্র' মন্ত্র রবীন্দ্রমানসে কি তরঙ্গ তুলল, সেই প্রাচীন মন্ত্রে তিনি কি নতুন স্বর সংযোজনা করলেন, পশ্চিমী দার্শনিকেরা তাঁর মনে কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, উপলব্ধির পদ্ধতি বা বিশ্বের রূপ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত কি, পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবধারা কি ছিল— এসবের স্বচ্ছন্দ সাবলীল এবং সার্থক আলোচনা পাওয়া যায় বইটির মধ্যে।

শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র করের জনগণের রবীন্দ্রনাথ বইটিতে আজকালকার সমাজাশ্রয়ী সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী ছায়া ফেলেছে— লেখক প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জনগণের এবং জনমানসের কতখানি যোগ ছিল। 'জনগণের রবীন্দ্রনাথ,' 'জনগণ ও রবীন্দ্রসংগীত,' 'রবীন্দ্রকাব্যে লোকবাণী,' 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধসাহিত্যে লোকসমাজ,' 'কবির দৃষ্টিতে জনগণ' ইত্যাদি সাতটি প্রবন্ধে বইটি সম্পূর্ণ। সমাজের উচ্চশ্রেণীতে জন্ম ও বিচরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কি করে সেই সংকীর্ণ সিংহাসনের বেড়া ভেঙে ওপারে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই কবিকে যে কৃষাণের জীবনের সত্যকারের শরিক, কি ভাবে রবীন্দ্রসংগীতের সুর সার্বশ্রেণিক সেতুবন্ধন করতে পারে, নবজাগ্রত ভারতবর্ষে সমাজ গ্রাম ও শিল্পব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কি রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন, তাঁর নাটক ও অন্যান্য রচনায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কি রূপ ও কি পদ্ধতির কথা তিনি বলেছেন— সেসমস্ত আলোচনা প্রবন্ধগুলিতে আছে। অনেক সময় দেখা যায়, এইরকম সমাজাশ্রয়ী সমালোচনা তার দৃষ্টিভঙ্গীর একাশ্রয়িতার ঔদ্ধত্যে সাহিত্যের সীমানাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, ফলে অপঘাতমৃত্যু অনিবার্য। বর্তমান লেখক সমাজাশ্রয়ী আলোচনার মধ্যেও সুস্থ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই বইখানি উৎরে গিয়েছে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও রচনার গুণেও তা পাঠকদের আকর্ষণ করে।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বাংলার লেখক। প্রথম খণ্ড। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী। চার টাকা।
সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি। প্রথম পর্যায়। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। গুপ্ত প্রকাশনী। সাড়ে চার টাকা।
সাহিত্য ও আলোচনা। শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স। দুই টাকা।
সাহিত্যপ্রবাহ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ। তিন টাকা।
মনপবনের নাও। রৈবত। দিগন্ত পাবলিশার্স। দু টাকা আট আনা।

বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের সময় থেকে হিসেব করলে বাংলা সাহিত্যের বয়স হল এক শ বছর। এর মধ্যে বাংলায় কোনো সাহিত্যতত্ত্বদর্শীর আবির্ভাব হয় নি এমন নয়। যাঁরা সত্যিকার সাহিত্যস্রষ্টা, তাঁদের শিল্পচিন্তা থাকেই। তবে পৃথিবীর সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে যাঁর পরিচয় অল্প, তাঁর পক্ষে শিল্পভাবনা হয় অনেকটা প্রয়োগিক (empirical)। সমালোচনার রাজ্যে হয়তো তার মূল্য হয় কম, যদিও লেখকের মর্ম উদ্‌ঘাটনে তা সাহায্য করে। মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে অনেক পরিমাণে পরিচিত ছিলেন। মধুসূদনের চিন্তার কিছু আভাস তাঁর কথাবার্তা ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মদৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে একটি সেরা critical mind হিসেবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুসূদনকে সমান স্থান দেওয়া যায় না। তবু আধুনিক বাংলার প্রথম সমালোচক-মন জন্মেছিল মধুসূদনের মধ্যেই। বাংলা ভাষা ও ভাবের রাজ্যে তাঁর অসমসাহসিক অভিযানের অন্তরিতিহাস লেখা হলে তা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পত্তি হত। কিন্তু সে ইতিহাস লেখা হলেও তখন তার পাঠক মিলত না। বঙ্কিম তাঁর চিন্তাগাঢ় প্রবন্ধেরও পাঠক পেয়েছিলেন, বা বলা যায়, তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি মোটামুটি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের আলোচনা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর সময়েও নজির হিসেবে ব্যবহারযোগ্য কোনো সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার এদেশে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তবু পেয়েছিলেন বঙ্কিমসাহিত্য, মধুসূদন-বিহারীলাল প্রভৃতির কাব্য। এ ছাড়া তাঁর সময়ে বৈষ্ণবকাব্য, সংস্কৃতকাব্য আবার নেমে এসেছে শিক্ষিত পাঠকের অভিজ্ঞতার কোঠায়। বিদেশী সাহিত্যও অনেক পরিমাণে অনুপ্রবেশ করেছে এদেশের চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ও বিদেশের যখন যে ঐশ্বর্য দেখেছেন, পেয়েছেন, নিজের মূল্যবোধের দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করতে কখনো দ্বিধা করেন নি। শুধু স্রষ্টা নয়, তত্ত্বদ্রষ্টা হিসেবেও যে তিনি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বাংলার সমালোচনাকে তিনি সার্থক সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তবু এ কথা বলতে হবে, লেখক ও পাঠকচিত্তের যে রসাস্বাদ ও জিজ্ঞাসার সমবায়ে সমালোচনার আসর প্রস্তুত হয়, তা রবীন্দ্রনাথের যুগেও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত তীক্ষ্ণধী সমালোচকের আবির্ভাব আবার কতদিনে সম্ভব হবে জানি না, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে সমালোচনার একটি আসর জ'মে উঠেছে। বহুমনের অভিজ্ঞতা এবং জিজ্ঞাসা এক খোলা সমিতির বৈঠকে মিলিত হতে চাইছে। দৃষ্টি পড়েছে সমালোচনার পক্ষে ভাষাকে উপযোগী ক'রে তোলার দিকে। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার পরিবেশন আর ভোক্তার অভাবে নিষ্ফল হচ্ছে না। বাংলার এক শ বছরের সাহিত্যের সদর রাস্তায় ও অখ্যাত অঞ্চলে চলেছে অনুসন্ধিৎসুর পরিক্রমা। রবীন্দ্রোত্তর এই যুগে গল্প কবিতা ইত্যাদির সার্থক সৃষ্টি কিছু পরিমাণে হয়ে থাকলেও যুগচিত্তের এমন কিছুকিছু লক্ষণ, এমন-একটি বুদ্ধিপ্রবণ অথচ মজলিশি মেজাজ দেখা যাচ্ছে যে, এ যুগকে বিশেষভাবে

সমালোচনার যুগ আখ্যা দিলে হয়তো তা নিরর্থক হবে না। এবং সমালোচনা এখন আমাদের চাই। সমালোচনাই সাহিত্যের এমন-একটি বিভাগ যেখানে বহু বিভিন্ন মনের সাক্ষ্য, বহু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার শুধু গ্রাহ্য নয়, আদরণীয়। সাহিত্য-সৃষ্টিলোকের এই অঞ্চলটাতেই লেখক-পাঠকের ভেদরেখাটুকু প্রবল নয়। এখানে লেখক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন পাঠকের ভূমিকা, পাঠক হঠাৎ দখল ক'রে বসেন লেখকের লেখনী।

যে বইগুলির আলোচনা করছি সেগুলির লেখকেরা একজন বাদে সকলেই অধ্যাপনা করেন। যিনি অধ্যাপক নন, তিনিও অধ্যাপক হলেই পারতেন। তা ছাড়া এঁরা সকলেই কাব্য-উপন্যাস ইত্যাদিও রচনা করেন। চিন্তাপ্রবণতা এঁদের কাছে আশা করা যায়; কিন্তু এঁদের কলম যে সেই চিন্তাকে পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব স্বীকার করেছে তার কারণ সাধারণ পাঠক আজ আর শুধু ভাবালুতায় সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, ভাবতে চায়। তাই এই লেখকেরা অগ্রসর হয়েছেন তাদের চিন্তার সেই চাহিদা মেটাতে। তা না হলে এই বাজার-মন্দার দিনে এইসব গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর সাহিত্যনিষ্ঠা, সক্রিয় মন, পরিশ্রমশীলতা ও সাহসের জন্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তিনি শুধু একটি কোনো মহৎ আদর্শকে আশ্রয় করে থাকেন নি, এমনকি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেও না। তাঁর কৌতূহলী চিত্ত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শিল্পাদর্শের ধারণা ও উপলব্ধি স্বীকার করেছে। বাংলার লেখক বইখানিতে তিনি বেছে নিয়েছেন বাংলার কয়েকজন গদ্যলেখককে। এই লেখকরা হলেন: শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকেরই আছে, এবং গদ্যলেখক হিসেবে তাঁদের মূল্যও স্বীকৃত হয়েছে। অপর কয়েকজনের রচনা অনেক আধুনিক পাঠকের কাছেই অজ্ঞাত। এমনকি শিক্ষিত পাঠকেরাও হয়তো এঁদের মধ্যে কোনো কোনো লেখককে একটিমাত্র বই বা বিচ্ছিন্ন রচনাংশের দ্বারা জানেন। শ্রীযুক্ত বিশী চেষ্টা করেছেন এই অন্যায়বিস্মৃতদের তাঁদের যোগ্যস্থানে স্থাপিত করতে, প্রত্যেকের সমগ্র রচনার বিচার করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দানটুকুর মূল্য নির্ণয় করতে। কিন্তু কোনো দানের যথার্থ মূল্য বুঝতে হলে সেই দান স্বীকৃত হয়েছে যে সাহিত্যে তারও প্রকৃতি ও গতির ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত বিশী তাঁর গ্রন্থে শুধু নষ্টকোষ্ঠির উদ্ধারই করেন নি, খ্যাতি-অখ্যাতির যে বণ্টন আগেই হয়ে গেছে সতর্ক সুবিচারের দ্বারা তার সামঞ্জস্যবিধানের মহৎ প্রচেষ্টাই তাঁর একমাত্র চেষ্টা নয়। তিনি চেয়েছেন বাংলা গদ্যের স্বরূপ স্বভাব ও প্রবণতার কথা ভাবতে। বাংলার গদ্যসাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বিভাগ, যথা স্যাটায়ার ও ঐতিহাসিক উপন্যাস কেমনভাবে কোন্ বিশেষ লেখক-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে ভূমিষ্ঠ হল, সে বিষয়েও তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রবল। কাজেই এক দিকে তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়েছে লেখকদের মানস-ইতিহাস, অপর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে দ্বন্দ্ব সমস্যা পরীক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রগামী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে। এ কাজ সহজ নয়। মাত্র ১১৪ পাতার একটি গ্রন্থে এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা দুরূহ বলেই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত বিশী এই রচনা-সমস্যার সমাধান করেছেন যেভাবে তা প্রশংসার যোগ্য। লেখকের মূল রচনা থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ তিনি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই আরো কিছুকিছু

নমুনার জন্যে পাঠকমনে ঔৎসুক্য থেকে যায়। তাঁর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে যে গ্রন্থ বা পূর্বতন সমালোচনা বা জীবনকথার প্রয়োজন, সেইগুলিকেই নিপুণ গার্হস্থ্যে তিনি সাজিয়ে ধরেছেন। লেখকের ঠিক যেখানটিতে বিশেষত্ব, বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর যে গুণটুকু মূল্যবান, ঠিক সেইখানেই তিনি তাঁর প্রশস্তির আলোকধারা বর্ষণ করেছেন। এর মধ্যে যখনই সুযোগ এসেছে বাংলা গদ্যসাহিত্যের মূল সমস্যাগুলির কথা ভাববার তখনি তিনি কখনো-বা তাঁর বিচিত্র ও বিস্তৃত অধ্যয়ন থেকে আহৃত সমালোচনাসূত্রের সহায়তায়, কখনো বা নিজের মননশীলতার দ্বারা সেই সমস্যার মর্মোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

শ্রীযুক্ত বিশী গদ্যরচনায় নৈয়ায়িক মন ও কল্পনাপন্থী মনের ক্রিয়া অনুধাবন করেছেন। তাঁর নিজের রচনায় এই দুই ভঙ্গির একটি সুসামঞ্জস্য ঘটেছে, যা প্রীতিকর। সামগ্রিকভাবে তিনি ফরাসী আদর্শের প্রাঞ্জলতা তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছলতা বজায় রেখেছেন, আবার প্রয়োজনমত কল্পনাসমৃদ্ধির সাহায্য নিতেও দ্বিধা করেন নি। বলেন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে কোনারক মন্দিরের তুলনায়, অবনীন্দ্রনাথের মানস-ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তাঁর এই ভাবময়তার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সমালোচক হিসেবে বিশী মহাশয়ের প্রবণতা সূত্রান্বেষণের দিকে। তাই তাঁর গ্রন্থের প্রধান লক্ষণ এর দ্বিধাহীন বাচন। এর সুবিধাও যেমন আছে, অসুবিধাও কিছুকিছু থাকা স্বাভাবিক। জনসনীয় সমালোচনারীতি ও ইংরেজি সাহিত্যে তার হ্রাসবৃদ্ধিশীল প্রভাবের কথা ভাবলেই এই রীতির ভালো ও মন্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক রীতি সিদ্ধান্তের দিকে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, কিন্তু তার কাছে সিদ্ধান্তের চেয়ে সন্ধানের সতর্কতাই মূল্যবান।

বাংলার লেখকের মুদ্রণ ও প্রচ্ছাদন চমৎকার। প্রতিটি লেখকের সুন্দর আলোকচিত্রে বইটি শোভিত। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী সকলেই বইটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন সন্দেহ নেই।

সূত্রের দোষে যাই থাক্, বহু বিচ্ছিন্ন তথ্যকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু এই সূত্র আবিষ্কারের জন্যে যে প্রস্তুতির দরকার তা দুর্লভ। প্রথমে চাই বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, তার পর আলোচ্য বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ। তার পর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সূত্র-আবিষ্কার। সকলের ভাগ্যে ঐ যোগাযোগ সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত বিশী এই গুরুভর দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহসেরও একটা সার্থকতা আছে; তার দ্বারা স্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ ফললাভ না হলেও অনেক সময় একটা মহৎ সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত হয়। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র সুসম্বদ্ধতার ও স্পষ্ট সিদ্ধান্তের দায়স্বীকার করেন নি। অথচ দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-অধ্যয়নে যে রসাস্বাদ, যে তথ্যসম্ভার, যে প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্নগুলি তাঁর মনে সঞ্চিত হয়েছে তাদের একটা-কোনো শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করবার তাগিদ তিনি অনুভব করেছেন। সাহিত্যপাঠকের ডায়ারিতে তিনি তাঁর সাহিত্য স্মৃতি ও চিন্তাকে বিষয়ভেদে আলাদা আলাদা প্রবন্ধে সাজিয়ে দিয়েছেন। বিষয়নির্বাচনে কোনো প্রাসঙ্গিক পূর্বাপরতা রাখবার চেষ্টা নেই। তার ফল ভালোই হয়েছে। এই ধরনের বইয়ে যে স্বাধীনতাবোধ লেখক ও পাঠক দুপক্ষেরই প্রয়োজন তা রক্ষিত হয়েছে। বিষয়সূচীর পনেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি এই: বীরবলের ভাষা; দৃষ্টিকোণ, প্রকরণ ও পরিভাষা; কৃত্তিবাস; আধুনিক বাংলা গদ্য, পত্র ও পত্রসাহিত্য, সাহিত্যে সংকেতভাষণ, বিবিধ প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী। এর থেকেই লেখকের রুচি ও চিন্তার বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে। এইসব প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য বিভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করে একত্রিত করাও একটা কাজ। লেখক প্রায় প্রতি প্রবন্ধেই

এই কাজ নিপুণভাবে করেছেন, যদিও তার ফলে তাঁর কোনো কোনো রচনা নামের নামাবলী ও তথ্যের তালিকায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি প্রশ্ন করেছেন, সমস্যাগুলিকে তীক্ষ্ণ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র আর পাশ্চাত্য সমালোচনা— এ দুয়ের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় আছে, তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কখনো অনাবশ্যকভাবে সংস্কারকঠিন হয়ে ওঠে নি। কখনো যে কোনো সিদ্ধান্তই তিনি করেন নি এমন নয়। পরিভাষার নির্বাচনপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর মতামত জানিয়েছেন, এবং তাতে বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়েছেন। যেমন রচনা ও প্রবন্ধ লেখাটিতে। আর্নল্ড ও বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁর মতামত তাঁর মননশীলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিছু পরিমাণে এবং মাঝেমাঝে জার্নালিজ্‌ম্ দোষাক্রান্ত হলেও সাহিত্যপাঠকের ডায়ারির উপভোগ্যতা সকলেই স্বীকার করবেন। লেখকের মনটি দ্রুতচারী ও নিপুণ। তাঁর ভাষাও তাঁর মনের অনুযায়ী। আধুনিক বাংলা গদ্যের যে লক্ষণ তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজের গদ্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। অনেক তথ্যভারকে অবলীলাক্রমে সংযত করে ভাষার দীপ্তি ও গতিশীলতা রক্ষা করা ক্ষমতার কাজ। সে ক্ষমতা হরপ্রসাদ মিত্রের আছে। সাহিত্যপাঠকের ডায়ারির দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্যে আমরা উৎসুক রইলুম।

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের সাহিত্য ও আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তিনি আলোচনা করেছেন রোমান্টিসিজ্‌ম্ ও ক্লাসিসিজ্‌ম্, বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ, স্টাইল, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের বহু-আলোচিত বিষয়। নতুন ক'রে এই ধরনের বিষয় আলোচনায় গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার প্রয়োজন। তা না হলে অনেকটা প্রচলিত মতামতের পুনরুক্তির মত শোনায়। বইটির দ্বিতীয়ভাগে তিনি বাংলার কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনা বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের উপন্যাসসৃষ্টির মধ্যে নীতি ও হৃদয়, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব কেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের এই অংশ সুখপাঠ্য। লেখকের সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যপ্রবাহে কিছুকিছু সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য প্রকাশ করে থাকলেও প্রধানতঃ বইখানি তাঁর সাহিত্যপাঠের আনন্দের বণ্টন। সমালোচনার ক্ষেত্রে মতামতের তীক্ষ্ণতামুক্ত আনন্দ প্রকাশেরও যে সার্থকতা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বইটির শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক প্রভৃতির উপর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। কিন্তু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতা ও জাপানী কবিতা এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি প্রবন্ধই ভালো লাগল। বাংলা কবিদের অনেকেই আজ অবহেলায় বিস্মৃতপ্রায়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মনে তাঁদের কাব্যের প্রতি যে দরদ সঞ্চিত আছে তার পরিচয় চিত্তাকর্ষক।

সাহিত্যরচনার পর হয় তার প্রকাশ। সেই প্রকাশকে আবার প্রচারিত করতে হয়। যা ছিল লেখকের নিভৃত কক্ষের প্রয়াস, তা গিয়ে পৌঁছয় সাহিত্যের বাজারে। এই বাজারের হালচাল সম্বন্ধে আলোচনায় লেখক পাঠক দু পক্ষেরই ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। রৈবত মনপবনের নাও বইটিতে এই মুখরোচক এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সুরটি অন্তরঙ্গ। লেখক কোনো গম্ভীর ভূমিকার অন্তর্বর্তী হয়ে কথা বলেন নি। তাই তাঁর কথা সহজেই মনে পৌঁছয়। তাঁর অনেক মতামতেই পাঠকেরা সানন্দে সায় দিয়েছেন ও দেবেন। বিশেষতঃ তাঁর মাইনর লেখক, মাসিকপত্র, নাট্য ও বেতারনাট্য, আধুনিক গান, সাহিত্য ও প্রচার প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখক পাঠক প্রকাশক, অর্থাৎ

সাহিত্যের বাজারের সকল পক্ষেরই অনুধাবনযোগ্য। রৈবত তাঁর মনপবনের নাও -খানি নিয়ে সাম্প্রতিক বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা ও জনজীবনের বিতর্কমুখর অঞ্চলগুলির মধ্যে দিয়ে বেশ 'এক চক্কর' ঘুরে এসেছেন। এর জন্যে এই 'নাও'এর নেয়েকে কোনো দুঃসাধ্য অধ্যবসায় করতে হয় নি, তিনি শুধু 'সহজবুদ্ধির পালটি' তুলে দিয়েছেন। তাইতেই নৌকো এগিয়েছে তরতর করে। এই সহজবুদ্ধির প্রসাদেই তাঁর দৃষ্টিটিও হয়েছে পরিষ্কার। তাই তিনি সাহিত্য ও শিল্পের সম্যক্ প্রচারকে যেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন, অপর দিকে 'ব্যবসায়ের বশংবদরূপে' তাদের ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি দেখেছেন ও দেখিয়েছেন যে, জনপ্রিয়তাই সাহিত্যের মাপকাঠি নয়, এবং কেবলমাত্র অসাধারণ হবার উৎকট চেষ্টা করলেই অসাধারণত্ব-লাভ হয় না। তিনি মনে করেন, 'সর্বমানবের মনকে যদি সাধারণ বলে অভিহিত করা যায়, তবে সেই সাধারণত্বের স্তরে নিজের মনকে বিচরণ করাতে না পারলে কোনো প্রতিভাই পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে না'। দেশের নেতৃস্থানীয়দের বক্তৃতা ও উপদেশবাহুল্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একমাত্র উৎকৃষ্ট জীবনের পরিবেশ তৈরি করেই উৎকৃষ্ট জীবন তৈরি করা সম্ভব'। রৈবত যে সহজবুদ্ধির জয়গান করেছেন, আজকের দিনের মানুষের বিভ্রান্ত জীবনে তার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। রৈবত আধুনিক গানের 'অর্থহীন আর্তনাদে' বিব্রত বোধ করেছেন। কিন্তু শুধু গান কেন— আধুনিক মন, আধুনিক জীবনও এক অর্থহীনতার ব্যাধির দ্বারা আজ আক্রান্ত। আজ আবার বিদ্যাসাগরের মত সহজ সতেজ একটি চরিত্রের আবির্ভাব হওয়া দরকার। নানারকমে জীবনের, ললিতকলার যে কেন্দ্রচ্যুতি আজ ঘটছে, তবেই হয়তো তার নিরসন হবে। রৈবতকে ধন্যবাদ, তাঁর আক্ষেপ ও আবেদন হয়তো একটা হাওয়া-বদলেরই সূচনা করছে। মনপবনের নাও -এর ভাষা মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ভাষা। এর একটা সুবিধাও যেমন আছে তেমনি আবার মাঝেমাঝে নিভৃত আলাপের আলস্য সংক্রমিত হয়েছে ভাষার স্পন্দনে। তার গঠন হয়েছে কিছু শিথিল, বেগ হয়েছে মন্থর।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

ভ্রম-সংশোধন

১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা। পৃ ৩৫, ছত্র ২৫। 'রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন' স্থলে 'রাধানাথ আবৃত্তি করিয়াছিলেন' হইবে।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান

সংযোজন ও সংশোধন

গত শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ৪৬-৪৮) হিন্দি-ভাঙা গানের যে পরিপূরক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে উল্লেখযোগ্য ছিল —'আনন্দ তুমি স্বামী' ও 'ব্যাকুল প্রাণ কোথা' গান দুটি শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির প্রমাণে হিন্দি-ভাঙা বলিয়া জানা যায়। স্বরলিপি-গীতিমালায় 'ভাসিয়ে দে তরী' গানের স্বরলিপি-শীর্ষে সুরকারের নাম না থাকায় উহা হিন্দি-ভাঙা মনে হয়, বহুশঃ উহার সদৃশ বলিয়া 'কাছে তার যাই যদি' গানটিও হিন্দি-ভাঙা মনে করা হইয়াছে। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' যে হিন্দি-ভাঙা, ইহা শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁহার রবীন্দ্রসংগীত (সংস্করণ ১৩৫৬, পৃ ১০৯) পুস্তকে লিখিয়াছেন। বিশ্বভারতী-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় গানের তালিকায় ও প্রথম পাদটীকায় (পৃ ৪৬ ও ৪৭) হিন্দি 'নইরে মা বরণ' গানের সহিত 'একি করুণা করুণাময়' ও 'এই-যে হেরি গো দেবী'র সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত, 'এই-যে হেরি গো দেবী' গানের অধিকতর সাদৃশ্য আছে হিন্দি 'মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ' গানের সহিত, এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র -সংখ্যায় ২১০ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখও আছে। 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' গানের সুর গুণী শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে পাওয়া গিয়াছিল, ১৮ মাত্রার 'নবপঞ্চতাল'টি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত— এ তথ্য দিয়াছেন শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পূর্বতালিকাধৃত একটি এবং নূতন চারিটি গানের মূল আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহার মধ্যে হিন্দি গান কয়টির সহিত বাংলা গানের সাদৃশ্যের বিষয় জানাইয়াছেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, আর কালমৃগয়া গীতিনাট্যের গানটি যে বিলাতি গানের সদৃশ তাহার সন্ধান দিয়াছেন শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী।—

বাংলা গান	আদর্শ	রাগ-তাল
আনন্দ তুমি স্বামী	ওঙ্কার মহাদেব	ভৈরবী-সুরফাঁকতাল
নিশিদিন মোর পরানে	উন সন জায় কহোরি	গান্ধারী-ত্রিতাল
রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে	মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম	খাম্বাজ-ত্রিতাল
সখী, আঁধারে একেলা ঘরে	সখি, আওত আঁধেরি ঘটা	
ও দেখবি রে ভাই	*The Vicar of Bray*	বিলাতি সুর

চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যকার ও বহুভাষাবিৎ অনুবাদক, গীতরচয়িতা ও স্বরলিপিকার রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁহার চিত্রসাধনার সহিত দেশের সম্যক পরিচয় ঘটে নাই।

অতি তরুণ বয়স হইতেই প্রতিকৃতি-চিত্রণে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল,[১] এবং শেষজীবন পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। খ্যাত-অখ্যাত, আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু শত লোকের পেনসিল-স্কেচ তিনি করিয়াছেন— কিন্তু সেগুলি প্রকাশের বিশেষ কোনো আয়োজন করেন নাই, সেগুলি যে বিশেষভাবে প্রকাশযোগ্য এমন কথাই সম্ভবত তাঁহার মনে হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে দুই-চারিখানি মাত্র তাঁহার জীবনকালে প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা বৈশাখ ১২৯২ বালক পত্রে তাঁহার 'মুখ চেনা' প্রবন্ধের আনুষঙ্গিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর প্রতিকৃতি, ফাল্গুন ১৩১৮ ভারতী পত্রে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবি, বৈশাখ ১৩২০ মানসী পত্রে প্রমথ চৌধুরীর চিত্র। রবীন্দ্রনাথের ছবি-কয়টির প্রতিলিপি দেখিয়া বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়ম রোথেনস্টাইন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাঁহার উদ্‌যোগে বিলাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে চিত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হয়, দুঃখের বিষয়, যোগাযোগের অভাবে তাহাও এদেশে বহুল প্রচারিত হয় নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়া রোথেনস্টাইন তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া যে চিঠি লেখেন তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল—

II. Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sept. 14, '12.

My dear sir,

Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been— and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sisters it has been my privilege to meet— I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us

১ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'। পৃ ৪৪ - ৪৫

here ; there is a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares. I hope, with your permission, to get one or two of your drawings reproduced here. If ever I return to India— a hope which is very near my heart— the privilege of your acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work.

Believe me to be most faithfully yours
William Rothenstein.

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist ; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent—এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।··যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোথেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত, এ কথাটা চাপা রাখ্‌লে চল্‌বে না। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি[২]

১৯১৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত পঁচিশখানি প্রতিকৃতির একটি সংগ্রহ[৩] বিলাতে প্রকাশিত হয়—

Twenty-five Collotypes/from the Original Drawings by/Jyotirindra Nath Tagore/Hammersmith/Made & printed by/Emery Walker Limited/1914

রোথেনস্টাইন এই গ্রন্থের ভূমিকায়, Durer, Holbein প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর চিত্রের সহিত

২ এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য চিঠি, 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

৩ এই গ্রন্থ হইতে কয়েকখানি চিত্র, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্র দুইটিতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে— **বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০, "অবনীন্দ্রনাথ"** ; **কার্তিক-পৌষ ১৩৫১, "সৌদামিনী দেবী"** ; VISVA-BHARATI QUARTERLY, **November 1910 "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর"**।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবি তুলনীয় এই কথা বলিয়া, পরিশেষে মন্তব্য করেন—"I know of few modern portrait drawings which show greater beauty and insight." গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এই ভূমিকার অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Two or three years ago I noticed, in a Bengali Review sent me by a friend, some small reproductions of what appeared to me to be remarkable drawings. When Mr. Rabindra Nath Tagore was in England last year I discovered they were done by one of his own brothers. He immediately wrote for some of the originals, and I received from the artist, Mr. Jyotirindra Nath Tagore, the generous loan of a number of his sketch books. Mr. Tagore is not an artist by profession. He has long been in the habit of making drawings of his friends and relations, for his own pleasure and interest, and these drawings seem to me to show just those qualities of concentration and sincerity which we should expect, but so rarely get, from the amateur. The heads show a sensitiveness to form which is unusual. They seem to me also to be drawn with the most perfect naturalness. Here is neither pre-occupation with Western models nor a conscious attempt to follow a Mogul tradition. The drawings of Indian ladies are especially remarkable. The 17th and 18th centuries imposed so weak and characterless a vision of woman on the European artist, that one has almost to go back to Durer and Holbein to find such frank and sincere portraits as these. Seeing the extraordinary variety and interest of the life about them, I have always wondered why the younger Indian painters adopt both the subjects and the formulas of the Mogul and Rajput traditions.

This is probably a momentary phase in the growth of modern Indian painting and is clearly due to a gallant desire to resist the thoughtless adoption of bad European workmanship and trivial and stupid subject matter. But there is good European painting and drawing and no lack of noble vision, and the influence of these would perhaps not be harmful, though probably few, if any, examples of this kind have reached India. If no vital school can be founded on the conscious adoption of an alien style, it is not likely to be brought to life by the practice of conscious archaism. It is not art which produces art, but passion. Art is the cultivation of passion, which like all cultivation, demands infinite labour, skill and patience, as well as

infinite will, if it is to bear ripe and wholesome fruit. Something of this passion I feel in the drawings of Mr. Jyotirindra Nath Tagore. It is of a simple and modest kind, but in each of the drawings one feels he was absorbed by the unique desire to express something of the delicacy of form and gravity of character of his sitter.. .

I know of few modern portrait drawings which show greater beauty and insight.

W. Rothenstein

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এইসকল ছবির খাতা ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে দিয়া যান—'নতুন কাকামশায়ের শেষ দান'। বর্তমানে তাহার অধিকাংশ 'রবীন্দ্র-ভারতী'র সংগ্রহে আছে। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন[৪] তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"এই ছবিব খাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে আমার সেদিন মনে হল কই আমরাও তো ছবি আঁকি কিন্তু ছেলে বুড়ো আপনার পর ইতর ভদ্র সুন্দর অসুন্দর নির্বিচারে এমন করে মানুষের মুখকে যত্নের সঙ্গে দেখা এবং আঁকা আমাদের দ্বারা তো হয় না, আমরা মুখ বাছি। কিন্তু এই একটি মানুষ তিনি কত বড় চিত্রকর হবার সাধনা করেছিলেন যে সব মুখ তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে উঠল, কি চোখে তিনি দেখতেন যে বিধাতার সৃষ্টি সবই তাঁর কাছে সুন্দর ঠেকল কোনো মুখ অসুন্দর রইল না। রূপবিদ্যার সাধনা পরিপূর্ণ না করলে তো মানুষ এমন দৃষ্টি পায় না!"

বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর যে একমাত্র ছবিখানি তাঁহার গ্রন্থাবলী ও অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত— বিহারীলালের আর কোনো ছবি রক্ষিত হয় নাই।

দ্রষ্টব্য॥ 'রেখা-চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'; মানসী, বৈশাখ ১৩২০; শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" পৃ ১৩৮-৪৬।

৪ "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর", বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২

স্বরলিপি

মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও,ওগো, ধরতে দাও ;
ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল,
হোথায় আমায় ডুবতে দাও,ওগো, মরতে দাও ॥
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা ;
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও,ওগো, পরতে দাও ॥
বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও,ওগো, সরতে দাও।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন—
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভ'রে, ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জাবন আমার ভরতে দাও ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II { র্সা [র্স]না -া । [ন]ধা পা -া I [প]মা গা -া । রা গা -া I
মা লা ০ হ তে ০ খ সে ০ প ড়া ০

I [গ]রা গা -মা । পা -া মা I গা -া -া । -া -া -মা I
ফু লে র্ এ ক্ টি দ ০ ০ ০ ০ ল্

I [ম]রা গা -া । মা পা -া I [প]গা -া -মা । মা -া -পা I
মা থা য়্ আ মা র্ ধ ০ র্ তে ০ ০

I পা -া -া । ধা না -া I [ন]পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা ০ ও ও গো ০ ধ ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -া} I পা -ধা ধা । ধা ধা -না I
দা ০ ০ ০ ০ ০ ও ও ই মা ধু রী ০

I [ন]পা -া -ধা । পধা -না না I ধপা -া -া । -া -া -া I
স ০ ০ রো০ ০ ব রে০ ০ ০ ০ ০ র্

I পর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I র্সা -া -া । -া -া -া I
না০ ই যে কো থা ও ত ০ ০ ০ ০ ল্

I পর্সা র্সা -া । র্সা র্সর্রা -র্র্সা I র্সনা -া -া । নর্সা -া -না I
হো॰ থা য়্ আ মা॰ য়্ ডু ॰ ব্ তে॰ ॰ ॰

I ধপা -া -া । ধা না -ধা I ধপা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা॰ ॰ ও ও গো ॰ ম ॰ র্ তে ॰ ॰॰

I ধপা -া -া । -া -া -া II
দা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ও

II { পা -া ধা । ধপা ধা -া I -া -া -া । -া -া -না I
দা ও গো মু ছে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I নপা পা -র্সা । র্সনা ধপা -া I -া -া -া । -া -া -া } I
আ মা র্ ভা লে॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I র্সা র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা -া । -া -া -া I
অ প ॰ মা নে র্ লি খা ॰ ॰ ॰ ॰

I র্রর্জ্ঞা র্রা -া । র্সা র্সা -া I পর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -র্রা I
নি ভৃ ॰ তে আ জ্ ব॰ ন্ ধু তো মা র্

I র্রনা না -র্রা । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -র্রর্সা । -র্সনা -া -া I
আ প ন্ হা তে র্ টি কা ॰॰ ॰ ॰ ॰

I নর্রা র্সা -া । না না -ধা] পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
ল লা ॰ টে মো র্ প ॰ র্ তে ॰ ॰॰

I ধপা -া -া । ধা না -ধা I ধপা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা॰ ॰ ও ও গো ॰ প ॰ র্ তে ॰ ॰॰

I ধপা -া -া । -া -া -া II
দা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ও

II সমা মা -া । মা মা -া I মা পা -া । পা পমা -পা I
ব॰ হু ক্ তো মা র্ ঝ ড়ে র্ হাও য়া ॰

I পগা গা -া । গা গা -মা I মা পা -া । -া -া -া I
আ মা র্ ফু ল ॰ ব নে ॰ ॰ ॰ ॰

I ^পদা -া দা । দা দা -ণা I ^ণপা পদা -ণা । ^ণদা পা -া I
শু ক্ নো পা তা ০ ম লিং ন্ কু সু ম্

I ^পমা -া -া । পা -া -ণদা I মপা -া -া । -া -া -া I
ঝ ০ র্ তে ০ ০০ দা০ ০ ০ ০ ০ ও

I পর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -র্রর্সা I
প০ থ্ জু ড়ে যা ০ প ড়ে ০ আ ছে ০০

I ^র্সনা না -র্রা । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -র্রর্সা । -না -া -া I
আ মা র্ এ জী ০ ব নে ০০ ০ ০ ০

I ^নর্রা -া র্সা । ^র্সনা না -ধা I পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা ও গো তা দে র্ স ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । ধা না -ধা I পা -া -ধা । না -া -র্সনা I
দা০ ০ ও ও গো ০ স ০ র্ তে ০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -া I র্সা র্সা -র্জ্জা । র্জ্জা ^র্জ্জর্রা -া I
দা০ ০ ০ ০ ০ ও তো মা র্ ম হা ০

I র্সা -া -র্রা । র্জ্জা র্রা -া I র্সনা -া -া । -া -া -া I
ভা ০ ন্ ডা রে ০ তেং ০ ০ ০ ০ ০

I নর্সা র্সা -না । র্সা -া -র্জ্জা I ^র্জ্জর্রা -া -া । -া -া -া I
আ০ ছে ০ অ নে ক্ ধ ০ ০ ০ ০ ন্

I র্রর্জ্জা র্রা র্সা । র্সা র্সা -া I র্সর্রা র্সা -া । ^র্সনা না -ধা I
কু০ ড়ি য়ে বে ড়া ই মুং ঠা ০ ভ রে ০

I ^ধপা -া -া । -ধনা -র্সাঃ -নঃ I ধপা -া -া । -া -া -া I
ভ ০ ০ ০০ ০ ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I সমা মা -া । মা মা -পা I পা -া -া । -া -া -া I
ভ০ রে ০ না তা য়্ ম ০ ০ ০ ০ ন্

I সমা -া মা । মা মা -পা I পা -া -ধা । পধা -না না I
অং ন্ ত রে তে ০ জী ০ ০ বং ন্ আ

I ধপা -া -া । -া -া -ধপা I মা -া -পা । মপা -ধাঃ -পঃ I
মাং ০ ০ ০ ০ ০র্ ভ ০ র্ তেং ০ ০

I মগা -া -া । -া -া -া II II
দাং ০ ০ ০ ০ ও